আয়োজন

বিমল কর

অনন্য প্রকাশন

৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট (দ্বিতল)

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
দোলপূর্ণিমা ১৩৭২

প্রকাশক
এইচ. রায়
অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
মুদ্রণ ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড,
১৫৪, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

হীরক রায়
কল্যাণীয়েষু

সুখ

সুখ

সু খ

সু খ

সু খ

সু খ

আ য়ো জ ন
আ য়ো জ ন
আ য়ো জ ন
আ য়ো জ ন
আ য়ো জ ন
আ য়ো জ ন

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কেরাণী পাড়ার কাব্য

ক্ষণকাল

নির্বাচিত গল্প

সুখ

কাল নজরে পড়ে নি ; আজ পড়ল। কাল শুভেনদের পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। টাঙাঅলা লোকটা খুবই ভাল, তারই কথা মতন স্টেশনের কাছে বাজার থেকে শুভেন কয়েকটা মোমবাতি, এক প্যাকেট চা, সামান্য চিনি এবং টুকি-টাকি আরও কিছু কিনে নিল। নিয়ে ভালই করেছিল, কেননা হলিডে হোমে পৌঁছে দেখল, আলোটালো নেই, চৌকিদার-টৌকিদার কোথায় যেন উধাও হয়েছে। টাঙাঅলা বুড়োই ডাকাডাকি করে ধরে আনল মদনলালকে।

মীনার মন ভেঙে যাচ্ছিল। এ রাম, শেষ পর্যন্ত এতো করে এই ঘুটঘুটে ভূতের জায়গায় বেড়াতে আসা? এর চেয়ে তাদের

কলকাতাই ভাল ছিল। সত্যি, শুভেনের যা বুদ্ধি, যে যা বোঝায় তাই বিশ্বাস করে ফেলে।

ঘরে ঢুকে মীনার খানিকটা ভরসা হল। একেবারে জলে পড়ার মতন অবস্থা নয়। ঘরটা ভাল, মাঝারি ধরনের; দু পাশে দুটো খাট, একদিকে পুরোনো আমলের দেরাজঅলা ড্রেসিং টেবিল, একটা ছোট আলনা। মস্ত মস্ত দুই জানলা ওপাশে। ঘরের পেছন দরজার গায়ে বাথরুম। আলো পাখা দুই-ই আছে—কিন্তু এখন জ্বলছে না। টাঙাঅলা ঠিকই বলেছিল, জঙ্গলের দিকে তারটার ছিঁড়ে প্রায়ই বিজলী বন্ধ হয়ে যায়।

দু-পাঁচটা কথা বলার পর শুভেন মদনলালকে দুটো টাকা দেবার পর দেখা গেল মদন বেশ বশ হয়ে গেছে। ধোয়ানো চাদর এনে পেতে দিল বিছানায়, হলিডে হোমের বারোয়ারী টেবল-ল্যাম্প এনে দিল, বলল গোসলখানায় জল দিতে বলেছে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার কী হবে?

রোটি, আণ্ডা, ভাত, ভাজি—সব হতে পারে। বাবু যা বলবেন মদনলাল বানিয়ে দেবে, লোক আছে। তবে থোড়া দেরি হবে।

দেরির জন্যে শুভেনের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। হোক দেরি। তার আগে দু-পেয়ালা চা দরকার।

শুভেন তার বাঙালী-হিন্দীতে বলল, "পহেলে চা পিলাও, মদনলাল। চা আউর পানি।" বলে চায়ের প্যাকেট, চিনি মদনের হাতে দিয়ে দিল।

জল এল প্রথমে। গ্লাস দুই জল খেয়ে শুভেন উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, "মিনু, খেয়ে দেখো, মার্ভেলাস জল! টেস্টই আলাদা।"

মীনাও জল খেল। সত্যি চমৎকার স্বাদ জলের।

মদনলাল গেল চা আনতে। জামাটা খুলে রেখে শুভেন একটা সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে জানলার সামনে দাঁড়াল। বাইরে অন্ধকার

ক'দিন আগে দেওয়ালী গিয়েছে। তখন থেকেই এদিকে একটা ঝড়-বৃষ্টির ভাব ছিল—, টাঙাঅলা বলছিল। এখন আর কোনো চিহ্ন নেই বাদলার। একেবারে পুরোপুরি হেমন্তকাল। শীতের রেশ আসছে বাতাসে। হয়তো শিশিরও পড়ছে রাত থেকে। গাছপালার গন্ধ বেশ ভারী হয়ে আছে, সেই সঙ্গে কেমন এক শুকনো ভাব।

"এবার হোল্ডঅলটা খুলে ফেলি, কি বলো?" শুভেন বলল।

মীনার হতাশা ভাবটা ততক্ষণে কেটে আসছে। যেমনটি বলেছিল শুভেন সেই রকমই তো: থাকার কোনো অসুবিধে নেই, হোটেল বা ধর্মশালার ভিড়-ভাড়াক্কা থাকবে না, বেশ নিজের মতন ফাঁকায় ফাঁকায় থাকা যাবে, নাচো গাও ছোটাছুটি করো, বরের কোলে বসে গলা জড়িয়ে সোহাগ করো, চাই কি মাইরি—তুমি যদি তোমার সেই ইয়ের ড্রেসটা পরে থাকো সারা দিন—তাতেও কোনো আপত্তি নেই।

যা বলেছিল শুভেন সবই প্রায় ঠিক, শুধু যদি আলো-টালোগুলো জ্বলত।

মীনা বলল, "হ্যাঁ, খোলো। চটি-ফটিগুলো বের করে নি।...আচ্ছা, শোনো—এদের এই তোষক চাদরে শোবে, না আমাদের বিছানা বালিশ বার করব?"

"কী দরকার! ধোয়া চাদর পেতে দিয়ে গেছে।"

"ওই বালিশ কিন্তু আমি মাথায় দিতে পারব না। নোঙরা চিটচিটে দেখাচ্ছে।"

"তুমি সোনা আমায় বালিশ করে নিও, মাথা অ্যাণ্ড কোল বোথ—", বলে শুভেন খোলা গলায় হেসে উঠল।

মীনাও ঘাড় বেঁকিয়ে ভেঙচি কাটল, "আহা কত শখ।"

শুভেন হোল্ডঅল খুলতে লাগল। দাঁতে সিগারেট। টেবল-ল্যাম্পটা আলোর চেয়ে শিস ছড়াচ্ছে বেশী। মীনা ঘরে ঢুকে জলের

ফ্লাস্ক, বেতের ছোট বাহারী টুকরি, সিনেমার ছবিঅলা কাগজ, একটা ইংরেজী ডিটেকটিভ উপন্যাস দেরাজ-আয়নার ওপর জড় করে রেখেছিল। সেগুলো সরিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগল।

"এই—" মীনা বলল, "খাট দুটো জুড়ে নিতে হবে যে !"

শুভেন দুষ্টুমি করে বলল, "কেন আলাদা আলাদা থাক না—ইংলিশ স্টাইল....।"

"তাই নাকি স্টাইল করবে!....বেশ করো—" মীনা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জব্দ করার গলায় বলল, "আমাকে দেওয়ালের দিকে দেবে।"

"কেন, জানলার দিকে শুতে ভয় ?"

"আজ্ঞে না, জানলার দিকে যে শোবে তাকে ভয়। তার তো ইংলিশ নেই।"

শুভেন আবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, "ভয়ের কিছু নেই। জানলাঅলা ফার্স্ট নাইট তোমার কাছে শোবে, তারপর ফিরে এসে নিজের বিছানায়, আবার ধরো লাস্ট নাইট তোমার বিছানায়—"

"কেন কেন ?"

"বাঃ, এ তো স্বামীর কর্তব্য।"

"ক-র্ত-ব্য," মীনা জিব ভেঙিয়ে সোহাগী গলায় বলল, "স্বামীটির কত কর্তব্যজ্ঞান রে ! ওর বেলায় কর্তব্য টনটন করছে।"

দু-জনেই খোলা গলায় হেসে উঠল।

হোল্ডঅল খুলে ফেলেছে শুভেন। সিগারেটের টুকরোটা ঠোঁটে লাগছিল। জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে শুভেন বলল, "তুমি সোনা এবার অন্ততঃ আমার কর্তব্যজ্ঞানের প্রশংসা করো। বলেছিলাম, এমন বিউটিফুল জায়গায় নিয়ে যাব—যেখানে তুমি-আমি ছাড়া কেউ থাকবে না। জাস্ট লাইক্ কপোত-কপোতী। বৃক্ষচূড়ে

বাঁধি নীড় যুগলে করিব....করিব....ধ্যাত শালা নীড়ের সঙ্গে মিল লাগানো বড় ডিফিকাল্ট।"

মীনা উঁচু গলায় হেসে উঠল।

মদনলাল চা নিয়ে এল।

শুভেন বলল, "শুনো—ইয়ে বিস্তারা জোড়া লাগানা হোগা।" বলে হাত দিয়ে দুটো খাট জোড়া লাগবার ইঙ্গিত করল। "হামারা হিন্দি থোড়া গলতি হ্যায়, ভাই। সামাল লেনা। লাগাও হাত লাগাও।

খাট জোড়া হল। মদনলাল কাছাকাছি কোথাও থেকে চাল ডিম-টিম কিনে আনবে, রাত্রের খানা বানিয়ে দেবে। শুভেন টাকা দিল। চলে গেল মদনলাল।

দু-জনে বিছানায় বসে বসে চা খেতে লাগল।

শুভেন বলল, "কেমন লাগছে তোমার?"

"জায়গাটা?"

"হ্যাঁ"

"ভালই লাগছে। তবে বড্ড অন্ধকার লাগছে।"

"আলো চলে এলে আর লাগবে না।"

"কখন আসবে আলো?"

"কি করে বলব! যে কোনো সময়ে চলে আসতে পারে। পাঁচ সাত মিনিট পরে আসতে পারে, আবার মাঝরাতেও। আমার কিন্তু দারুণ লাগছে, মিনু। এই ঘর, চারদিকে কাম অ্যাণ্ড কোয়াইট, বাতাসটাই কি রিফ্রেশিং, বাইরে গাছপালা, অন্ধকার, আকাশে তারা ....আর তুমি-আমি বিছানায় বসে বসে রাজার হালে চা খাচ্ছি। দারুণ ব্যাপার। শালা, কলকাতায় আমাদের ঘরটার কথা ভেবে দেখো, একেবারে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় যেন, হরদম সামনে দিয়ে লোক যাচ্ছে, পেছন দিয়ে আঁশটে গন্ধ আসছে আস্তাকুঁড়ের,

পাশে বারোয়ারী পায়খানা····মরে যেতে ইচ্ছে করে।····আমি তোমায় বলছি, এখানে পনেরোটা দিন থাকার পর তুমি কলকাতায় ফিরে দেখো, মিনিমাম চার কেজি ওয়েট গেইন করেছ, তোমার গাল-টাল ফুলকো হয়ে যাবে মাইরি, ইয়েতেও মাংস লেগে যাবে····" বলতে বলতে শুভেন বাঁ হাতটা স্ত্রীর কোমরের দিকে বাড়িয়ে জাপটে ধরল। ধরে পেটের কাছে হাত রাখল। তারপর চোখ টিপে হেসে বলল, "আর তোমার ইয়ের যা গ্রোথ হবে—দেখবে।"

মীনা স্বামীর হাত সরাল না, চোখে শাসনের ভাব ফুটিয়ে বলল, "আমার ইয়েতে তোমার কী! যা আমার তা আমার।"

"বা বা, বেশ! এখন শুধু তোমার! ..ভাল কথা সখি, কিন্তু তোমার ওই ইয়ের ব্যাপারে আমার কি কোনো অবদান ছিল না?" বলতে ব'লতে শুভেন মুখ টিপে দমক মেরে মেরে হাসছিল।

মীনা এবার হেসে ফেলে স্বামীর কাঁধে ধাক্কা মারল। "তোমার বড় মুখ খারাপ।"

শুভেন হাসতে হাসতে বলল, "অবদান শব্দটা ভাল বাংলা মাইরি, ওর মধ্যে কিছু খারাপ নেই।"

মীনা আর বসে থাকল না। চা খাওয়া শেষ। বাথরুমে যাবে। বলল, "আমায় একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দাও, বাথরুমে যাব।"

মোমবাতি জ্বালিয়ে শুভেন নিজেই বাথরুমে দিয়ে এল। এসে বলল, "দারুণ বাথরুম, আমাদের কলকাতার শোবার ঘরের চেয়েও সাইজে বড়।"

মীনা সাবান-টাবান নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

শুভেন হোল্ডঅল থেকে আপাতত বাকি যা দরকার বের করে নিল। নিয়ে পা দিয়ে ঠেলে হোল্ডঅল খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল। ছুটকো আরও ক'টা কাজ সেরে বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল একটু। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল।

সেই কোন সকাল থেকে তোড়জোড় শুরু করেছিল, এতোক্ষণে একরকম শেষ। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে লেগে পড়েছিল তারা দু'জন। এটা নাও, ওটা নাও, কোনটা লাগবে কোনটা লাগবে না তা ঠিক করতে করতে দু জনেরই সময় চলে যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল। দশটা বাইশে ট্রেন। এখনও স্যুটকেস গুছোনো হল না। দাড়ি কামানো স্নান জুতো মুখ গোঁজা—কত কি যে রয়েছে ছাই। মীনাকেও না-না করে উনুন ধরিয়ে দুমুঠো ভাতে-ভাত করতে হবে, তারপর ঝিকে দিয়ে বাসনপত্র ধুইয়ে আবার সব গুছিয়ে রেখে যেতে হবে। নিজের স্নান-খাওয়া, সাজগোজ রয়েছে।

সোয়া ন'টা নাগাদ সব তৈরি।

ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশনে পৌঁছতে পৌনে দশ। টিকিট কাটা ছিল, গাড়িতে চেপে বসতে বসতে দশটাই বাজল।

আর ধন্য আজকালকার ট্রেন। সময় বলে কিছু জানে না। হাওড়াতেই চল্লিশ মিনিট দেরি করে ছাড়ল। তার ওপর শালা এমন ঢিমে তালে চলল যে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দেরি করতে করতে পাক্কা এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লেট লেজুড় করে নিয়ে এখানে সন্ধ্যের মুখে পৌঁছে দিল। সময় মতন এলে বিকেলে পৌঁছে যেত।

যাক্ গে, নিরাপদে এসে হাজির হওয়া গেছে এই যথেষ্ট। শুভেনের মনে এখন আর কোনো চিন্তা নেই ! সে নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। আজ বছর দেড়েক ধরে মীনাকে সে বলছিল—দাঁড়াও না—একবার বিয়েটা করি তারপর দু-জনে সেরেফ মাস খানেকের জন্যে এমন জায়গায় কেটে পড়ব—কোনো বেটা আমাদের পাত্তা পাবে না। তোমার দাদা-ফাদা, আমার যত জঘন্য পিসি-মাসির দলকে কাটিয়ে মাইরি অন্তত: একটা মাস দু-জনে একেবারে নিজেদের জীবন কাটাব। আওয়ার পারসোনাল অ্যাণ্ড প্রাইভেট লাইফ। এদের জ্বালায় নিজেদের কিচ্ছু নেই।

বিয়ের ব্যাপারটা চুকতে চুকতেই দেরি হয়ে গেল। মাস সাতেক পিছিয়ে গেল। বিয়ের পর শুভেন পড়ল বাড়ির সমস্যায়। কিছুতেই একটা বাড়ি জোটে না—বাড়ি মানে একটা অন্ততঃ ভদ্রলোকের থাকার মতন ঘর। বেড়াল ছানার মতন বউকে আজ এখানে কাল ওখানে বয়ে বেড়িয়ে শেষে টালা ব্রীজের তলায় এক বন্ধুর দৌলতে একটা ঘর পেল দোতলার শেষ প্রান্তে। বারোয়ারী বাড়ি। পুরনো আমলের। টিনের ছাদের তলায় রান্না-বান্না, আর এজমালি কল-পায়খানা।

কোনো উপায় ছিল না শুভেনের। মীনাও আর বেড়াল ছানার মতন ঘুরতে রাজী নয়। টালার সেই বাড়িতে দাম্পত্য জীবন শুরু করার পর শুভেন রীতিমত অপরাধ বোধ করতে লাগল। কথা ছিল, বিয়ের পরই যে বউ নিয়ে মাসখানেক অজ্ঞাতবাস করবে —কোথায় সেই অজ্ঞাতবাস? মীনা ঠাট্টা করে বলত, 'কি গো, তোমার সেই প্রাইভেট লাইফের কী হল?' শুভেন বলত, 'দাঁড়াও, তালে আছি। দীঘা-টীঘা যেতে চাও তো এখুনি হয়ে যায়—আমি একটু ফাঁকায় আউট অফ দি অর্ডিনারি জায়গায় যেতে চাই।' সেই জায়গা আর খুঁজে পাচ্ছিল না শুভেন। জায়গার দোষ নয়, অফিসের ছুটি, টাকাপয়সার ব্যবস্থা, এটা-সেটার ঝঞ্ঝাট লেগেই ছিল। শেষে দুম করে একটা সুযোগ জুটে গেল। শুভেনের এক বন্ধুর ভগিনীপতি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। তিনিই বললেন—ব্যবস্থা করে দেবেন, কোনো অসুবিধে হবে না।

ব্যবস্থা করতে দুটো মাসই লেগে গেল প্রায়। মীনার পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছে এ-সময়। শরীরটাও এলোমেলো করছিল তার। মাস দুয়েকেই সামলে নিল। ডাক্তারবাবু বললেন, যান না, এখন ভাল ক্লাইমেট, ওঁকে নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আসুন। তাতে ভাল হবে। শী ইজ কোয়াইট নরম্যাল, কোনো ভয় নেই, কিছু হবে না, চলে যান।

শুভেন দেখল, মীনাও পা বাড়িয়ে রয়েছে।

আবার কখন কিসে ফেঁসে যাবে—কাজেই দ্বিধা না করে বউ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শুভেন। সাঁওতাল পরগনার অনেক খ্যাতি শুনেছে সে। আজ এসে দেখছে—সত্যিই সুন্দর। তাও এখন অন্ধকার, রাতও হয়ে এল : কাল সকালে বোঝা যাবে জায়গাটা কত ভাল।

মীনার ব্যাপারটা কী? শুভেন যতবার কান পাতে ততবার জল ঢালার শব্দ পায়। কারবার দেখেছ! এই নতুন জায়গায়, নতুন জলে এত সাবান ঘষার কী আছে? তারপর কালই গলাব্যথা, সর্দি, জ্বর।

শুভেন উঠে পড়ে দরজায় ধাক্কা মারল, "এই—?"

ধাক্কা মারতেই দরজা খুলে গেল। আর মীনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আঁতকে উঠে বলল, "এই!"

"যা বাব্বা, দরজা খুলেই রেখেছ?"

"ছিটকিনিটা লাগাতে পারলাম না", বলতে বলতে মীনা গা ঢেকে নিল।

শুভেন স্ত্রীকে দেখল। দেখে লোভ হল। দুষ্টুমি করে বলল, "আমি একবার ছিট-কিনিটা লাগিয়ে দেখি, বন্ধ করতে পারি কি না?" বলে বাথরুমের ভেতরে ঢুকে শুভেন দরজা বন্ধ করতে গেল।

মীনা স্বামীর চালাকি বুঝতে পেরে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি আগোছালো হয়ে দরজা দিয়ে পালাতে গেল। "এই, শয়তানি করবে না!"

শুভেন ততক্ষণে বউকে ধরে ফেলেছে দু-হাতে জাপটে। ঠাণ্ডা গা, সাবানের টাটকা গন্ধ। শুভেন অনেকটা খেলাচ্ছলে বউকে চুমু খেতে লাগল।

দুই

কাল নজরে পড়েনি ; আজ সকালে নজরে পড়ল। সকালবেলায় শুভেন মীনাকে জাগিয়ে দিয়ে বাইরে ফটকের পাশে পায়চারি করতে করতে আশপাশ দেখছিল। ফটকের গায়ে দু পাশে দুই ইউক্যালিপটাস মস্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, বাড়ির দিকে আর যা-তা কিছু মামুলি গাছপালা, যেমন : পেছন দিকে একটা কাঁঠাল গাছ—কম্পাউণ্ড ঘেঁষে, গোটাকয়েক পেঁপে গাছ, সামনের দিকে কলকে আর করবী, দু-চারটে রঙ্গন। বাড়িটা বাংলো গোছের দেখতে ; আকার প্রায় ইংরেজী এল অক্ষরের মতন, মাথায় টালির ছাদ, ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। খড়খড়ি করা দরজা জানালা। নিশ্চয় পুরনো বাংলো বাড়ি।

মীনা চোখেমুখে জল দিয়ে গায়ে পাতলা চাদর জড়িয়ে বাইরে এলে স্বামী-স্ত্রী ফটকের সামনে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগল। কাঁকুরে মাটির রাস্তা, অজস্র নুড়ি ছড়ানো, সামান্য লালচে। রাস্তাটা দু-দিকেই সোজা চলে গেছে। দু-পাশে গাছ—আম আর দেবদারু। মাঝে মাঝে কাঁঠাল। পুবের দিকে মস্ত মাঠ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, তারপর কিছু ক্ষেতখামার। আরও দূরে জঙ্গল। সূর্য উঠে গিয়েছিল।

রাস্তার একটা দিক স্টেশনের দিকে চলে গেছে। অন্যটা কোথায় কে জানে। আশেপাশে অজস্র ঝোপ আর উঁচুনিচু মাঠ, দু-চারটে খাপরা-ছাওয়া কুঁড়ে। সারা রাতের হিমে শিশিরে সব কেমন ভিজে ভিজে। সকালের বাতাসে সতেজ স্বাস্থ্যকর গন্ধ ভেসে আসছিল। কিছু পাখি-টাখি উড়ে যাচ্ছে। এক ঝাঁক বক উড়ল।

আকাশে। শুভেন মহা খুশি। চারদিক আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল মীনাকে। "দারুণ জায়গা কি বলো?"

মীনাও খুশি। "সত্যি, বড় সুন্দর।" "এই হল রিয়েল বিউটি বুঝলে মিনু? যা এখানে আছে—সব ন্যাচারাল। লোকে যে সব জায়গায় গরুর পালের মতন ছোটে—সেই জায়গাগুলো এক একটা বাজে হল্লার আখড়া। গুচ্ছের লোক, হোটেল, চায়ের দোকান, কাপ্তেনীর কাম্পিটিশান, বেলেল্লাপনা—! দূর দূর—কোনো সুখশান্তি আছে সেখানে গিয়ে! শুধু নাচতে যাওয়া। আর এখানে দেখো কিছুই সাজানো গোছানো নেই। জাস্ট মাঠ ঘাট জঙ্গল আকাশ রোদ বাতাস····। আর মাইরি তুমি-আমি।"

মীনা ঘুমভাঙা চোখে হাসল। "তুমি গায়ে একটা কিছু দিয়ে এলে না কেন? ঠাণ্ডা পড়েছে।"

"আমার লাগবে না।"

"বাহাদুরি করো না। এটা অঘ্রাণ মাস মনে রেখো। এ তোমার কলকাতা নয়।"

"না হোক কলকাতা। আমার রক্ত গরম, বুঝলে সোনা।"

মীনা বেঁকা চোখ করে স্বামীকে দেখতে দেখতে হেসে বলল, "তা আর বুঝব না, কাল যা জ্বালিয়েছ সারা রাত।"

শুভেন প্রথমটায় বুঝতে পারে নি, তারপর বুঝল—বুঝে এই সাত সকালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

চায়ের জন্যে দু-জনেই আবার বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল।

ফটকের কাছে আসতেই দু-জনেরই একই সঙ্গে এমন কিছু নজরে পড়ল যা কাল রাত্রে পড়ে নি।

শুভেনদের ঘর ফটকের মুখোমুখি। মানে বাড়ির প্রায় পশ্চিম দিকে। দক্ষিণ দিকে যে টানা বারন্দা—মানে এল অক্ষরের লম্বা দিক—সেদিকের বারান্দায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

পরনে পাজামা গায়ে জামার ওপর চাদর, হাতে ছড়ি। মাথার চুল একেবারে সাদা, চোখে চশমা।

ভদ্রলোককে দেখে শুভেন অবাক হয়ে গেল। এ বাড়িতে আরও লোক আছে নাকি? যাঃ শালা! এখানেও লোক। নাকি বুড়োটা অন্য কোথাও থেকে এমনি এসেছে?

"মিনু ওই বুড়োটা কোথ্ থেকে এল?"

মীনাও দেখছিল। সেও বুঝতে পারছিল না।

আরও কয়েক পা এগিয়ে—ফটকে ঢুকে শুভেনদের নজরে পড়ল, বেতের চেয়ারে এক বৃদ্ধা বসে রয়েছেন মোটা থামের আড়ালের জন্যে তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না আগে। বৃদ্ধার সামনে কাঠের ছোট চৌকি, তার ওপর বাটি-টাটি কি যেন সাজানো। তাঁরও চোখে চশমা। গায়ে শাল জড়ানো মাথার চুল সাদা।

মীনা বলল, "শুধু বুড়ো কি গো, বুড়িও রয়েছে। করছে কী বুড়িটা?"

শুভেন হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিল। তার তাকাতে ইচ্ছে করল না। এখানেও লোক? কোথাও কি একা থাকার উপায় নেই? শুভেন যেন কেমন ঘৃণা বোধ করল আচমকা ওই বৃদ্ধদের ওপর। ওদের দিকে না তাকিয়ে সোজা নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ঘরে এসে শুভেন বলল, "কাল তো ওদের দেখলাম না। আজ কোথ্ থেকে হাজির হল?"

মীনা বলল, "কাল ওদিকটা আর আমরা দেখলাম কোথায়? যা অন্ধকার—ভূতের মতন বসে থাকলাম নিজেদের ঘরে।"

বিরক্ত হয়ে শুভেন বলল, "মেজাজ খারাপ করে দিল। ওই বুড়োবুড়ি এখন পেছনে লেগে থাকবে!"

মীনারও তেমন পছন্দ হয় নি ব্যাপারটা : কিন্তু কিছু বলল না। কী আর বলবে !

চা খেয়ে জামাকাপড় বদলে শুভেনরা বাজারের দিকে বেড়াতে বেরুলো। ততক্ষণে মদনলালের কাছে সবই জানা হয়ে গেছে। ওই বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা দেওয়ালীর আগে থেকেই এখানে আছেন—সপ্তাহ দুই আরও থাকবেন। গত বছরও শীতের মুখে ওরা এসেছিলেন, তবে অল্প দিন ছিলেন সেবার। ওই বুড়াবাবুর ভাতিজা বিজলী-সাহাব।

শুভেন বুঝতে পারল, মদনলালের খাতিরের ঘটা ও-পক্ষে বেশি।

বাজারের দিকে হাঁটতে শুভেন বলল, "বুঝলে মিনু, ওই বুড়োবুড়িকে একেবারে পাত্তা দেবে না। পাত্তা দিয়েছ কি লাইফ হেল করে ছাড়বে।"

"কী আর হেল করবে ?"

"ওরে ব্বাস, তুমি বুড়ো বেটাদের চেন না! আমি চিনি। প্রথমেই শালা তোমার নাড়ি নক্ষত্রের খবর নেবে, কোথায় বাড়ি, বাপঠাকুরদার নাম থেকে শুরু করবে—তারপর তোমার অফিসের চাকরি, মাইনে, বাড়িভাড়ায় এসে নামবে। এর পরই নিজেদের নাইনটিন ফোরটিনএর গল্প শোনাতে লাগবে, বিগ বিগ কথা বলবে, দু-দশটা সাহেবের আমড়াগাছি করবে—তখন আট আনা সের মাছ পাওয়া যেত, একটা বেগুনের ওজন হত পাঁচ পো, বাবুরা রাত্রে এক বাটি করে ক্ষীর খেত—এই সব পট্টি ঝেড়ে তোমার মাথা ধরিয়ে দেবে। শালা বুড়োদের আর আমি চিনি না। মাল এক একটা।"

মীনা বলল, "বুড়ো মানুষরা বড় বকবক করে।"

"শুধু বকবক ? তুমি কিছু জানো না—! ওই বুড়ো প্রথমে

তোমাকে বউমা বউমা করবে, তারপর বউমার ওপর আদরে গলে গিয়ে কত কীর্তিই যে করবে তা তো জান না—?"

"যাঃ !" মীনা স্বামীকে ধমক দিল।

"যাঃ নয়, একবার একটু বউমা বউমা করতে দাও—তারপর দেখবে, শ্বশুরের কত আহ্লাদ।"

মীনা স্বামীর হাতে চিমটি কেটে দিল। অসভ্যতা করো না।"

শুভেন হেসে বলল, "কী করব ভাই, বুড়োহাবড়াদের কেসটাই হল ইয়ের—তখন আর কিছু থাকে না; পারভারসান নিয়ে বেঁচে থাকে—!"

"আহা বুড়োর বুড়ি রয়েছে না ?"

"বুড়ি থাকলে কি হবে—ছুঁড়ি তো নেই।"

মীনা এবার ধমকে উঠে স্বামীকে হাতের ব্যাগ দিয়ে মারল। শুভেন জোরে হেসে উঠল। হাসি শুনে মনে হল, তার বিরক্তি যেন কিছুটা কেটে গিয়েছে।

বাজারটা বড় কিছু নয়। পরিচ্ছন্নতাও কম। তবু শুভেনরা বেহারী ময়রার দোকানে বসে সকালের জলখাবার সেরে ফেলল। চা খেল মাটির খুরিতে। তরিতরকারির বাজার ছোট। গ্রাম থেকে আনা টাটকা দু-চারটে ফুলকপি ছিল, কাঁচা টমাটো, বেগুন, আলু, মুরগীর ডিম। একটা লোক নদী থেকে মাছ ধরে এনে বিক্রি করে, তার কাছে সামান্য মাছ ছিল, ছোট ছোট মাছ।

বাজার সেরে ফিরতে ফিরতে সামান্য বেলা হল। মদনলালকে বাজারগুলো ধরিয়ে দিলেই চলবে। মদনের এক সঙ্গী আছে কালী; রান্না বান্না সেই করে। শুভেনরা আজ সকালে সবই জেনে গিয়েছে। মদনলাল হল আসলে চৌকিদার, তার জিম্মাতেই এই বাংলো বাড়ির সব কিছু। দক্ষিণের দিকে বারান্দাটা হঠাৎ নিচু হয়ে নেমে ছোট ছোট যে গোটা দুই খুপরি করেছে তার

একটাতে থাকে মদনলাল; আর অন্যটায় কালী। পাশেই রসুইঘর। কালীই কখনো কখনো জল তোলার কাজ করে দেয়: নয়তো মদন-লাল সামনের কুঁড়ে থেকে কাউকে ডেকে আনে ফাইফরমাস খাটার জন্যে, দু-একটা টাকা দেয়। সকালের দিকে অবশ্য বাঁধা জমাদার আসে ঝাড়ঝুড়ের জন্যে।

বাড়ির কাছে এসে শুভেন বলল, "মিনু, সেই যে একটা কথা আছে—ম্যান প্রপোজেজ গড ডিজপোজেজ—ব্যাপারটা তাই হল। কোথায় ভাবলাম আমরা দুই ছোঁড়াছুঁড়ি দিবি৷ এখানে স্বর্গ-টর্গ করে কাটিয়ে দেব, তা না শালা কোথা থেকে দুই বুড়োবুড়ি এসে হাজির হল! সব মজা মাটি করে দিল মাইরি।" বলে বিরস মুখে শুভেন হাতের সিগারেটটা মাঠে ছুঁড়ে দিল। তারপর বলল, "কত রকম ফূর্তি করতাম—আর করা যাবে না।"

"কেন?"

"দূর, পাশেই লোক। দেওয়ালের গায়ে গায়ে ঘর। একটু হইহুল্লোড় করলেই কানে যাবে, তেমন ধামসাধামসি আর করতে পারব না। মরে যেতে ইচ্ছে করছে।"

মীনা আড়চোখে চেয়ে হাসল। "তুমি কি সেই ছেলে নাকি? কিছুই ছাড়বে না।"

"ছাড়ব কেন—", শুভেন বলল, "আমি শালা একটা কেরানী। তিন বচ্ছর ধরে লেগে থেকে থেকে তোমায় বিয়ে করলাম। একটা ফোর্থ ক্লাস ঘর জোগাড় করতে মাসকয়েক লাগল। বারোয়ারী বাড়িতে থাকি। কোনো প্রাইভেসি নেই, একটুও নির্জনতা চুপচাপ নেই, আমরা কোনো দিন গলা ছেড়ে গল্প পর্যন্ত করতে পারলাম না। ভাবলাম, এখানে ক'টা দিন রাজার মতন মেজাজ নিয়ে থাকব, তোমায় নিয়ে যা খুশি করব—তা না শালা ঠিক কোথ্‌ থেকে এক ওল্ড বাম্বু ঢুকে গেল। হ্যাত্‌....।"

মীনা আর কত হাসবে। স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার মতন করে বলল, "কী এলো গেলো পাশে কারা থাকল ভেবে। আমরা আমাদের মতন থাকব।"

"নিশ্চয় থাকব। ওদের ইগনোর করব····সত্যি বলছি, তুমি দেখো, আমি ওই বুড়োকে কাছে ঘেঁষতে দেব না। আলাপ-টালাপই করব না। আর তুমি সোনা দয়া করে ওই বুড়ির কাছে গিয়ে মাসিমা মাসিমা করো না। বুঝলে?"

ততক্ষণে বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছে মীনারা। কম্পাউণ্ড ওয়ালের ওপারে বাড়ির বারান্দায় বুড়োবুড়িকে দেখা গেল না। চেয়ার পাতা রয়েছে। সামনের ফাঁকা জমিতে চওড়া লাল পাড়ের একটা শাড়ি ঝুলছে দড়িতে, একটা সেমিজ। আর বুড়োর পাজামা।

তিন

প্রথম দিনটা শুভেন খুব সর্তক থাকল। কোনো রকমে দুপুর কাটতেই মীনাকে নিয়ে বাজারের দিকে বেরিয়ে পড়ল। সেখান থেকে টাঙা ভাড়া করে গেল মাইল তিনেক দূরে এক কুণ্ড দেখতে। উষ্ণ জলের কুণ্ড। সেখানে এক দেহাতী মেলা চলছিল তখন। মেলায় বেড়িয়ে সন্ধ্যের মুখোমুখি আবার ফিরে এল। স্টেশনেই বসে বিশ্রাম করল। দু-একটা গাড়ি দেখল। তারপর বেশ অন্ধকার হয়ে যাবার পর বাড়ি ফিরল। শুভেন টর্চ নিয়ে বেরিয়েছিল আজ। দরকার তেমন হয় নি। এক ফালি চাঁদ উঠেছিল—কাল যে কখন কোথায় ওই চাঁদের ফালি হারিয়ে গিয়েছিল শুভেন বুঝতে পারল না।

আজ বাত্তি ছিল।

ঘরে এসে বাত্তি জ্বেলে শুভেন কিছু বলার আগেই দেখল মীনা বিছানায় কোমর এলিয়ে পা ঝুলিয়ে শুয়ে পড়েছে। ক্লান্ত।

শুভেন ক্লান্ত স্ত্রীর পাশে শুয়ে পড়ে বলল, "টাঙার ঝাঁকুনিতে তোমার কষ্ট হয়েছে?"

"না।"

"পেটে লাগে নি তো?"

"না।"

শুভেন বউয়ের ঘাড় আর চুলের গোড়ায়, নাক মুখ ঘষতে লাগল। ঘষতে ঘষতে মনে হল, এখানকার মাঠ ঘাট জঙ্গলের অনেক ধুলো যেন মীনার চুলে আর গায়ে জড়িয়ে গেছে। শুভেন পরম আবেগে আস্তে আস্তে চুমু খেতে লাগল।

মীনা বলল, "দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

শুভেন বলল, "থাক না—খোলা থাক; সমস্ত কিছু বন্ধ করেই তো জীবন কাটালাম। এখন খোলাই থাক।"

সামান্য পরে মীনা উঠল। কাপড়-টাপর ছাড়বে, গা-হাত ধোবে।

সন্ধ্যের শেষ এবং রাতটুকুও চমৎকার কাটল। নিজেদের মতন করেই। অন্য কেউ এখানে আছে বোঝা গেল না। শুধু একবার শুভেন বাথরুমে থাকার সময় লক্ষ করল, তাদের বাথরুমের ওপাশে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। বুঝতে পারল, পাশের ঘরের বাথরুমও এর গায়ে লাগানো।

দ্বিতীয় দিনের সকালেও শুভেন একরকম সতর্কতার সঙ্গে বৃদ্ধদের এড়িয়ে গেল। বিকেলে আর পারল না, একেবারে বৃদ্ধের মুখোমুখি।

ডোরাকাটা জুট ফ্ল্যানেলের পাজামা পরনে, গায়ে বোধ হয় মোটা সুতির গেঞ্জি, কটস্ উলের বুশ শার্ট, হাতে বাঁধানো লাঠি।

ভদ্রলোক কলকে ফুলের গাছটার কাছে পায়চারি করছিলেন। শুভেন লক্ষ করে নি, বিকেলে বেড়াতে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বেরিয়েছে, মীনা দরজায় তালা দিয়ে আসবে এখুনি—সিঁড়ির দু-তিনটে ধাপ নেমে মাঠে আসতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল।

শুভেন ভেবেছিল, চোখ ফিরিয়ে নেবে। পারল না। পারা যায় না।

ভদ্রলোকের মুখে কী ছিল শুভেন বুঝতে পারল না। লম্বা নাক, চওড়া কপাল, অল্প কিছু সাদা ধবধবে চুল মাথায়। বেশ দীর্ঘ চেহারা। স্বাস্থ্য অবশ্য তত মজবুত নয়। কত বয়েস হবে? সত্তর?

কিংবা কাছাকাছি। ভাঙা চেহারা, চামড়া কুঁচকে ভাঁজ পড়েছে —তবু এই বয়েসের পক্ষে একেবারে অক্ষম শরীর নয়।

ভদ্রলোক এমন করে চোখেমুখে হাসলেন যেন তিনি শুভেনেরই অপেক্ষা করছিলেন; এবং শুভেনকে অন্ততঃ চোখে চেনেন।

"আপনারাই পরশু দিন এসেছেন শুনলাম", ভদ্রলোক কেমন পরিচিত গলায় বললেন, "কাল একবার দেখলাম। তারপর বোধ বোধ হয় আর ঘরে ছিলেন না?"

শুভেন হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, "না। রাত্রে ফিরেছি।" তার গলার স্বর নিস্পৃহ, ঠাণ্ডা। যেন আলাপটা তার পছন্দ হচ্ছে না।

"কোথা থেকে আসছেন? কলকাতা?"

ঘাড় নাড়ল শুভেন।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন, "জায়গাটা ভাল। শরীর-স্বাস্থ্যর পক্ষে বেশ ভাল। দু-চার দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন।" বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে তাকালেন। তারপর সামান্য উঁচু গলায় বললেন, "দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি আসছি।" বলে শুভেনের দিকে তাকিয়ে এই রকম আচমকা বিদায় নেবার জন্যে যেন লজ্জা প্রকাশ করলেন, "পরে আবার কথাবার্তা হবে....আচ্ছা....।" ভদ্রলোক যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

শুভেন ওই বারান্দার দিকে তাকাল। বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। চওড়া পাড়অলা শাড়ি, গায়ে পুরো হাতা জামা, চোখে চশমা। ঘষা কাচ না কি? দূর থেকে চোখ দেখা যাচ্ছে না।

ভদ্রলোক বারান্দায় উঠে বৃদ্ধা মহিলার হাত ধরলেন, তারপর সাবধানে আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে টেনে এনে ধাপগুলো নামাতে লাগালেন বলে বলে।

মীনা ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও দেখছিল।

মীনা বলল, "ওভাবে সিঁড়ি নামাচ্ছে কেন? উনি অন্ধ নাকি?"

শুভেন মুখ ফিরিয়ে নিল। "কী করছিলে তুমি এতক্ষণ?"

"বাথরুমে গিয়েছিলাম একটু, কেন?"

শুভেন হঠাৎ কেমন বিরক্তি বোধ করল। কেন কে জানে। বলল, "বাথরুমেই যাও দশবার করে। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।"

মীনা স্বামীর এই আচমকা বিরক্তি বুঝল না।

আজ হাঁটা পথে অনেকটা বেড়ানো হল। হাঁটতে হাঁটতে সেই রাম মন্দির পর্যন্ত এগিয়ে আবার বাজারের দিকে ফেরা। তারপর স্টেশন। অনেকক্ষণ স্টেশনে বেড়িয়ে আবার সন্ধ্যের মুখে বাড়ি ফেরা। তখনও আবার একফালি চাঁদ রয়েছে আকাশে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে শুভেন বলল, "মিনু, বুড়ো ভদ্রলোক যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন; আমি ওঁর নামটাও জিজ্ঞেস করলাম না। ব্যাপারটা বড় খারাপ হল। অসভ্যতা অসভ্যতা লাগছে।"

মীনা প্রথমটায় জবাব দিল না। তারপর বলল, "আবার তো দেখা হবে জিজ্ঞেস করে নিও।"

শুভেন কিছু বলল না। ফটকের সামনে এসে তাকাল। দক্ষিণের দিকে বারান্দায় আলো পড়েছে সামান্য। ভদ্রলোকরা ঘরে রয়েছেন।

এখানকার আবহাওয়ায় শীত এসে পড়েছে বেশ বোঝা যায়। আজ হালকা কুয়াশা জমে গেছে এরই মধ্যে। বাতাসে শুকনো ঠাণ্ডা।

মীনা তালা খুললো ঘরের। শুভেন বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। ঘরের মাঝমধ্যিখানে একটা আলো ঝুলছে, বালবটা মেরে কেটে ষাট পাওয়ারের, টিমটিম করে জ্বলে, আভা হলুদ মতন। একটা পুরোনো পাখা, কালচে রঙ, মাথার ওপর স্থির হয়ে আছে।

মীনা বিছানায় বসল। বসে হাই তুলল একবার, ছোট হাই।

"এখানে হাঁটাহাঁটি করলে পায়ের গোছে অত ব্যথা করে কেন বলো তো ?"

"উঁচু নিচু জায়গা বলে।"

"এই, একটু জল দাও", মীনা আদর করে হুকুম করল।

শুভেন জল গড়িয়ে দিল।

মীনা জল খেল। "আজ আর রাত্তিরে খেতে হচ্ছে না!"

"কেন ?"

"স্টেশনে একগাদা খাওয়ালে।"

"হজম হয়ে যাবে", শুভেন বলল গ্লাসটা রেখে দিতে দিতে, "এখানকার জল, সবে তো সন্ধ্যে।"

জামা-টামা ছাড়তে লাগল শুভেন। মীনা একটা বিছানায় গা এলিয়ে দিল। শুভেনের হয়ে যাক—তারপর কাপড় ছাড়বে সে।

শুভেন পাজামা পরল, গায়ে পাঞ্জাবি। বাথরুমে গেল।

মীনা শুয়ে থাকল। পাশ ফিরল। আবার সোজা হল। কলকাতার বাড়ির কথা মনে পড়ল। মনে পড়লেই কেমন যেন লাগে। এ রকম একটা ঘর পেত তারা! নিরিবিলি, চুপচাপ। কী আরামই না লাগত। তা কি আর পাওয়া যাবে!

শুভেন বাথরুম থেকে বেরিয়েছে কি বাতি নিবে গেল। 'যাঃ!'

"কী হল ?" মীনা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

শুভেন বলল, "দাঁড়াও, টর্চটা নিয়ে দেখি। আবার কারেন্ট গেল না কি ?"

হাতড়ে হাতড়ে টর্চ নিল শুভেন, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দেখল। তারপর ফিরে এসে বলল, "কারেন্ট গিয়েছে। এখানে এই হালে চলে না কি ? আচ্ছা তো!"

"মোমবাতি জ্বেলে দাও', মীনা বলল।

মোমবাতি জ্বালাবার পর মীনা উঠে শাড়িটা ছাড়ল। গায়ের জামাও। শুভেন সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল বেঁকা ভাবে।

টর্চটা তুলে নিয়ে মীনা বাথরুমে চলে গেল।

শুভেন শুয়ে শুয়ে দেখছিল, প্রায় জানলা ঘেঁষে জ্যোৎস্না দাঁড়িয়ে আছে, ঝাপসা জ্যোৎস্না, ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে।

বাথরুম থেকে যেন এক ছুটে কোনো খবর দিতে বেরিয়ে এল মীনা। বলল, "এই, এদিকে এসো।"

"কী"

'বুড়ি গান গাইছে।"

"গান ?"

"বাথরুমের বাইরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াও না—শুনতে পাবে।"

"কী গান গাইছে!"

"কে জানে! গুনগুন শুনছিলাম।"

শুভেন আগ্রহ বোধ করে উঠল। বাথরুমে গেল। ফিরে এসে বলল, "ঠাকুর দেবতার নাম করছে বোধ হয়। ভজন ভজন লাগল।"

ততক্ষণে হাত মুখ মুছে গায়ে জামা পরেছে মীনা। ঘরের শাড়িটা পরে ফেলেছে।

শুভেন এসে বিছানায় বসল। মীনা আয়নায় কোনোরকমে মুখ দেখে চুল গুছিয়ে নিল। নিয়ে স্বামীর পাশে এসে বসল।

সামান্য চুপচাপ। শুভেন বউয়ের হাত ধরে খেলা করতে লাগল। "বাইরে জ্যোৎস্নাটা দেখেছ ? দিন পাঁচেক পরে ফার্স্ট ক্লাস জ্যোৎস্না হবে।" কোন হিসেবে শুভেন কথাটা বলল সেই জানে।

বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে পড়ল শুভেন। বউকে টেনে বুকের ওপর নিল। ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, কানের মধ্যে ফুঁ দিল আস্তে আস্তে। মীনার গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। শুভেন এই খেলাটা খুব পছন্দ করে। মীনার কানে ফুঁ দিলে তার গায়ে

কাঁটা দেয়। মীনার গায়ে কাঁটা দিলে শুভেনের খুব আরাম লাগে। সে তখন বউয়ের হাত পায়ে নিজের হাত পা ঘষতে থাকে।

আদর করে বউকে ক'টা চুমু খেল শুভেন।

মীনা স্বামীর মতিগতি জানে। কোমরের কাছে চিমটি কেটে বলল, "এখন এ সব করো না তো, ছাড়ো!"

"এখন তা হলে কী করব?"

"কিছু করতে হবে না। শুয়ে থাকো।"

"চুপচাপ?"

"হ্যাঁ, চুপচাপ—" বলে মীনা আঙুলের খোঁচা মারল বুকে দুষ্টুমি করে।

শুভেন সামান্য চুপচাপ শুয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ বলল, "মিনু?"

"উঁ!"

"চলো, ও ঘর থেকে একটা ভিজিট দিয়ে আসা যাক।"

"এখন? এই অন্ধকারে?"

"কী হয়েছে? অন্ধকারই তো ভাল। বেশী গ্যাজোর গ্যাজোর করার চান্স পাবে না। ভদ্রতা করে একবার দেখা দিয়ে চলে আসব।"

মীনা কিছু ঠিক করতে পারছিল না।

শুভেন উঠে পড়ল, বলল, "অন্ধকারে ভূতের মতন বসে থেকেই বা কি হবে! চলো ঘুরে আসি। বুড়োবুড়িদের দেখার জন্যে আলোর দরকার হয় না।"

শুভেন উঠে দাঁড়াল দেখে মীনাও উঠল।

টর্চ নিল শুভেন, তালা নিল, তারপর মোমবাতি নিবিয়ে বাইরে এল। মীনা দরজার বাইরে।

চার

একই ধরনের ঘর। এটা চওড়ার দিকে একটু বড়। সেই দুটো খাট। একটা নেয়ারের অন্যটা লোহার। শুভেনদের মতন কাঠের নয়। খাট দুটো কেমন করে যে জোড়া করা হয়েছে বোঝার উপায় নেই। আসবাবপত্রের মধ্যে একটা আর্মচেয়ার বেশী, বেতের মোড়াও আছে একটা। বড় ধরনের গোটা দুই স্যুটকেস একপাশে, বেশ কিছু টুকিটাকি। একটা টাইমপিস ঘড়ি আয়নার কাছে রাখা।

মীনারা ঘরের চৌকাঠে পা দিতেই আদর করে ভদ্রলোক ভেতরে ডেকে নিয়েছিলেন।

লণ্ঠন জ্বলছিল একপাশে। পরিষ্কার লণ্ঠন। বৃদ্ধা মহিলা নেয়ারের খাটে বসেছিলেন—কোল করে। তাঁর বিছানার পাশে কাঠের জলচৌকির ওপর ছোট মালসায় সামান্য কাঠকয়লার আগুন। কোলের ওপর উলের গোলা, কাঁটা। অথচ তাঁর চোখে যে চশমা তার একটা কাচ ঘষা, কিছু দেখা যায় না। অন্য কাচটা ভীষণ পুরু। কেমন করে উনি দেখছেন? শুভেন ওই কাচের মধ্যে দিয়ে এই আলোয় ভাল করে বৃদ্ধার চোখ দেখতে পাচ্ছিল না। যা দেখা যাচ্ছিল তাতে মনে হল, কাচের আড়ালে দুর্বল ঝাপসা ঘোলাটে এক চোখ।

ভদ্রলোক শ্বেতপাথরের খল নুড়িতে কিছু যেন মাড়ছিলেন, আদর করে ডেকে বসতে বললেন, শুভেনকে আর্মচেয়ারে, মীনাকে বিছানায়। তারপর বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সুবর্ণ, এই ছেলেটি আর বউমাটি পাশের ঘরে উঠেছে গো। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে।"

মীনা নেয়ারের খাটের এক পাশে বসেছে। বৃদ্ধাকে সে দেখছিল।

পাকা সোনার মতন রঙ ছিল বোধ হয় গায়ের, বয়েসে চাপা পড়েছে। খানিকটা থলথলে চেহারা, মাথায় বোধ হয় বেঁটে. চাঁদের মতই গোল মুখ। মাথার চুলের বারো আনাই সাদা, সিঁথির জায়গাটায় চুল উঠে চামড়া বেরিয়ে আছে, তারই ওপর মোটা করে সিঁদুর লেপা। মুখখানিতে জরার সমস্ত চিহ্ন স্পষ্ট, ঝুলে পড়া চিবুক, চামড়াগুলো ভাঁজ পড়া, শুকনো, ঠোঁট দুটি এখনও পুরুষ্ট রয়েছে সামান্য।

সুবর্ণ যেন যারা এসেছে তাদের দেখার জন্যে ব্যগ্র হয়ে মাথা ঘোরাতে লাগলেন। ভদ্রলোক বললেন, "ও একরকম দেখতেই পারে না। একটা চোখের ছানি কাটাবার পর চোখটাই গেল। বাঁ চোখটায় ছানি পড়েছে, কাটাবার ভরসা করতে পারছি না। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, কি বলো সুনু?" ভদ্রলোক যেন স্ত্রীর সঙ্গে মজা করলেন।

শুভেন বুঝতে পারল, ভদ্রলোক স্ত্রীর ভাল নামটা আগে বলেছিলেন, পরে ডাক নামটা বললেন।

সুবর্ণ বিছানার ওপর হাতড়াচ্ছিলেন, মীনাকে যেন একটু দেখতে পেলেন। সারা মুখ হাসিতে ভরে উঠল। "এসো মা, এসো। তোমাদের কথা উনি বলছিলেন। পরশু এসেছ?"

মীনা বলল, "পরশু সন্ধ্যেবেলা। এসে দেখি অন্ধকার।"

"আজও দেখলে তো বাতি চলে গেল! এখানে এই রকম রোজই হয় প্রায়। তোমাদের বাতিটাতি আছে?"

"মদনলাল একটা দিয়েছিল। মোমবাতিও রয়েছে।"

ভদ্রলোক খোল নলচেটা দেখে নিলেন। তারপর কাচের ছোট গ্লাসে জল নিয়ে স্ত্রীর কাছে এলেন। "নাও, খেয়ে নাও।" বলে স্ত্রীর হাতে খোলটা ধরিয়ে দিলেন।

ওষুধ খাওয়া হল। একটু জলও।

ভদ্রলোক বললেন, "সন্ধ্যেবেলায় একটু করে মকরধ্বজ খাওয়াই।

তাঁদের ধাত। ঠাণ্ডা একেবারে সইতে পারে না।" বলতে বলতে তিনি ওষুধের পাত্রটা ধুয়ে রেখে দিলেন।

শুভেন সবই লক্ষ করছিল। বলল. "এখানে শুনলাম বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। ওঁর তা হলে খুবই কষ্ট হবে।"

"না খুব কষ্ট হবে না। এখানে শুকনো ঠাণ্ডা। শীত ঠিক মতন পড়তে পড়তে নভেম্বরের শেষ। তার আগেই আমরা চলে যাব।....আপনারা কতদিন থাকবেন ?"

শুভেন অস্বস্তি বোধ করল। এই বৃদ্ধ তাকে আপনি আপনি করে কথা বলছেন। সামান্য দ্বিধার গলায় শুভেন বলল, "আমায় কেন আপনি বলছেন ! আমি কত ছোট।"

ভদ্রলোক বড় সরল মুখে হাসলেন। "বেশ, তুমিই বলি।.... কত দিন থাকবে বাবা ?"

"ইচ্ছে আছে দিন পনেরো।"

"বাঃ ! থেকে যাও। খুব ভাল জায়গা। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। জল-হাওয়া বড় ভাল। আমি তো ওই বুড়িটিকে নিয়ে তিন বার এলাম। প্রথমবার আমার এক বেহারী বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলাম। অনেকটা দূরে। বড় আদর-যত্ন করে রেখেছিল। সে বেচারী মারা যাবার পর এখানে এসে উঠি। গত বছর। এই সময়। এ বছরেও এলাম। কী জানি আসছে বছর আবার পারব কি না !"

"আপনার ভাইপো শুনলাম এখানের...."।

"হ্যাঁ, আমার ভাইপো শম্ভু বিহার স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের এঞ্জিনিয়ার, সে এখানে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়েছে।" ভদ্রলোক একটু হাসলেন, "বার কয় এলাম বলে চেনাশোনা হয়ে গেছে। আমাদের কত যত্নকরে রাখে এরা। বড় ভাল মানুষ মদন-টদন।"

সুবর্ণ ততক্ষণে মীনাকে আরও কাছে বসিয়ে নিয়ে তার হাত

নিজের হাতে নিয়ে আদর করে বোলাচ্ছেন। "তুমি মেয়ে রোগা নাকি খুব ? হাত-টাত ভরা কই ? কলকাতায় খাও কী ?"

মীনা হেসে ফেলল। বলল, "রোগা কোথায় ? আপনি রোগা ভাবছেন !"

মাথা নাড়তে নাড়তে সুবর্ণ শুভেনের দিকে মাথা ঘোরালেন। "ও ছেলে, মেয়ে আমার রোগা না মোটা ?"

শুভেন এমন অসঙ্কোচ ডাক, এমন আন্তরিক সম্বোধন যেন শোনে নি। আচমকা কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। সামলে নিয়ে হেসে বলল, "রোগাই বলতে পারেন।"

মীনা স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল।

সুবর্ণ যেন কত আনন্দ পেয়েছেন, মীনার মুখটি দেখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন।

শুভেন ভদ্রলোককে জিজ্ঞস করল, "আপনি কোথায় থাকেন ?"

"আমি বাবা আগে মাইনস্ ইন্সপেক্টর ছিলাম। বিহারের নানা জায়গায় কাজকর্মে ঘুরেছি। তারপর রিটায়ার করে ধানবাদে একটা ছোট বাড়ি-টাড়ি করেছিলাম। ভুল হয়েছিল। বড় কনজেসটেড জায়গা হয়ে গিয়েছে।....ও, আমার নামটা তোমায় বলা হয় নি। বরদাকান্ত মুখুজ্যে। খাস ঘটি। আদি বাড়ি ছিল, উত্তরপাড়ায়। তোমার নামটি কী ?"

শুভেন তার নামধাম বলল।

মীনার সঙ্গে সুবর্ণ কথা বলছিলেন, "তোমার শ্বশুরবাড়িতে কে কে আছে মেয়ে ?"

"কেউ না ; নিজের কেউ নেই।"

"আহা ! বাপের বাড়িতে ?"

"দুই দাদা, মা। বাবা নেই।"

"না মেয়ে, তোকে সত্যি বলছি, মেয়েদের যদি বাপ না থাকে—তবে বাপু কেমন হয় জানিস—কদর থাকে না। আমি মেয়ে হয়েই তোকে বলছি। মা ভাল, বাপ আরও ভাল। আমার বাবা আমার বিয়ের পর তিন রাত্তির খায় নি, শোয় নি। যখন বাপের বাড়ি গেলাম, বাবার সে কী আহ্লাদ···সে যদি কেউ দেখত ভাবত ছেলেমানুষ—"

বরদাকান্ত স্ত্রীর কথা শুনছিলেন। গলার শব্দ করলেন। তারপর আস্তে গলায় শুভেনকে বললেন, "বুড়ির পেছনে লাগি একটু—," বলে গলা উচু করে স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, "তোমার বাবার খুব সুখ্যাতি করছ। কিন্তু বলতে নেই, আমার শ্বশুরমশাই আর যাই করুন জামাইকে অনেক অচল জিনিস চালিয়েছিলেন।"

সুবর্ণ কানে খাটো নন অন্ততঃ, শুনতে পেলেন। বললেন, "একটাও চালায় নি। আমার বাবা অচল চালাবার মানুষ নাকি? মিথ্যে বলো না।"

বরদাকান্ত শুভেনকেই যেন সাক্ষী মানছেন, বললেন, "তুমিই বলো, বিয়ের পর যদি তোমার বউ—ও বউমা, তুমি কিছু মনে করো না—,য' বলছিলাম হে, তুমি বলো—বিয়ের পর যদি তুমি দেখতে তোমার বউয়ের একটা পা ছোট, অন্যটা বড়—তোমার কী মনে হত?"

সুবর্ণ বাধা দিয়ে বললেন, "পা কেন ছোট হবে, একটা পায়ের গোড়ালি খুব কেটে গিয়েছিল, একটু গর্ত মতন ছিল!"

"বাঁ হাতের কনুই বেঁকা", বরদাকান্ত হাসিচোখে বললেন গম্ভীর মুখ করে।

"কনুই বেঁকা নয়, হাড়টা একটু উঁচু।"

"নাকটা তো একটুও উঁচু নয়—"

"তা কি করব! ভগবান যার যেমন গড়ন দিয়েছেন। আমি বরাবরই খেঁদা-খোঁদা।"

বরদাকান্ত থামলেন না। মজা করে বললেন, "বুঝলে শুভেন, আমার শ্বশুর মশাইয়ের এই মেয়েটিকে একদিন—বিয়ের পর-টর হবে—আমার ঘড়িটাতে দম দিতে বলেছিলাম। পরের দিন দেখি আমার অমন দামী বিলেতী ঘড়ি আর চলছে না। দমের ঠেলায় স্প্রিং কেটে গিয়েছে।"

সুবর্ণ মীনার মুখটি নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, "আমি তার কী করব মেয়ে, বল? দম দেওয়া মেয়ে বিয়ে করলেই পারত বাবু, আমরা তো ওটা শিখি নি।"

ঘরের মধ্যে হাসি যেন ফেটে পড়ল। শুভেন অট্টহাস্য হেসে উঠল, মীনাও হাসতে হাসতে মুখে হাত চাপা দিল। হাসি আর থামছিল না। বরদাকান্তও হাসছিলেন, জোর নয়, মুখ চেপে। তারপর শুভেনের দিকে তাকিয়ে এমন এক কৌতুকের ভঙ্গি করলেন, যেন তিনি হেরে গেছেন।

নিজের জায়গা ছেড়ে উঠলেন বরদাকান্ত। সুবর্ণর সামনে এসে মালসার নেবা-আগুন লক্ষ করলেন, তারপর মালসা উঠিয়ে নিয়ে বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

এই প্রবল হাস্যের পর শুভেন খুব হালকা বোধ করছিল। বাস্তবিকপক্ষে শুভেন বুঝতে পারছিল এই বৃদ্ধ দম্পতির ওপর তার বিন্দুমাত্র আক্রোশ বা বিরক্তি আর নেই। নিজেকে অনেক সহজ অসঙ্কোচ লাগছে এখন।

মীনা হেসে বলল, "আপনি তখন গান গাইছিলেন, আমরা শুনতে পেয়ে চলে এলাম।"

"গান!... ও মেয়ে, বুঝেছি। গান কেন হবে, ঠাকুরের নাম করছিলাম—গীতগোবিন্দ...। আমি গান-টান জানি না মা, উনি এক সময়ে চর্চা করতেন।"

মীনা ছেলেমানুষের মতন বলল, "আবার একটু গান না? ঠাকুরের নামই গান!"

সুবর্ণ যেন কেমন লজ্জা পেয়ে বললেন, "যাঃ—খুনসুটি করিস না।"

আরও কটা কথা হল। সাধারণ। সাংসারিক। ততক্ষণে বরদাকান্ত আবার ফিরে এসেছেন। তাঁর হাতে এক কেটলি জল।

বরদাকান্ত প্রথমে একটা ছোট চায়ের পটে জল ঢাললেন। বাকি গরম জলটা ঢাললেন হট ওয়াটার ব্যাগে। তারপর গরম জলের ব্যাগটা স্ত্রীর হাঁটুর তলায় গুছিয়ে দিলেন।

শুভেন প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। পরে দেখল, বরদাকান্তের ঘরে নিজেদের চায়ের সরঞ্জাম আছে। তিনি নিজের হাতে দু-কাপ চা করলেন। করে শুভেন আর মীনাকে দিলেন।

বড় অপ্রস্তুত বোধ করল শুভেন। "আপনি আবার চা করতে গেলেন কেন? আমরা বার দুই খেয়েছি।"

"তাতে কি খাও....!"

চা খেতে খেতে আবার গল্প শুরু হল। শুভেন প্রায় অসঙ্কোচেই কথা বলছিল।

"ওর শরীর ভাল থাকে না—আপনি কী করে ওঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়ান?" শুভেন জিজ্ঞেস করল।

"ওকে নিয়ে পারি," বরদাকান্ত বললেন, "চল্লিশ বছর বয়েই বেড়াচ্ছি। শরীরের আর দোষ দেব কি বলো! সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে সুনুর—উনিশ বছর বয়সে একটা জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিল।" বলে গলা নামিয়ে বললেন, "ওভার গ্রোথ হয়ে গেল। ডেড চাইল্ড। অপারেশন করে বের করতে হল। ও-সবের আর কোনো আশা রইল না। সুনুও মরোমরো। ছ'মাস বিছানায়। ওই ফাঁড়াটা কাটল তো আবার বছর সাতেক পরে গল ব্লাডার নিয়ে

পড়ল। আবার অপারেশন। তারপর এই তোমার বুড়ো বয়েসে ঘাড়ের কাছে একটা টিউমার দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। আবার অপারেশন। তিন তিনটে অপারেশনের ধাক্কা সামলে শরীরে কি থাকে বলো! খুচরো আধি-ব্যাধি তো আছেই। ছানি কাটিয়ে একটা চোখ গিয়েছে। অন্য চোখটা ওই তোমার নিবে আসা সলতের মতন রয়েছে, যে কোনো সময় নিবে যেতে পারে। তার ওপর ডায়েবেটিস, বাত, নিশ্বাসের কষ্ট....”

সুবর্ণ সবই শুনছিলেন, শুভেনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “ও ছেলে, উনি যখন অচলের কথা বলেন—তখন এইসব ভেবে বলেন—বুঝলে তো?”

বরদাকান্ত সরল স্নিগ্ধ গলায় বললেন, “তা বলি। কিন্তু সুনু, এই অচলটুকু না থাকলে আমিও যে সচল থাকতুম না।”

সুবর্ণ চুপ করে থাকলেন। তাঁর মুখে দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই, কাতরতা নেই। পরিপূর্ণ তৃপ্ত এমন এক মুখ করে চেয়ে আছেন—যেন জীবনের সমস্ত প্রাপ্তি তাঁর মিটে গেছে। একটু পরে মীনার হাত নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, “কে যে কাকে সচল রাখল জানি না, মা। ঠাকুর জানেন, তিনিই জানেন কে কবে অচল হয়ে পড়বে....!”

বরদাকান্ত কথা বললেন না। শুভেন কেমন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল। মীনার মুখ বেদনায় ভরে উঠল। কী এক বিষণ্ণতা—যার কোনো রূপ নেই, আকার নেই, সীমা নেই—এই প্রায়ান্ধকার ঘরে জমে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে।

এমন সময় মদনলাল এল। হাতে মালসা। নতুন করে আগুন করে এনেছে।

বরদাকান্ত উঠলেন। দেখলেন ধোঁয়া আছে কিন্তু আগুনে। জলচৌকির ওপর নিজের হাতে রাখলেন। তারপর একটা শাল

এনে স্ত্রীর পিঠে জড়িয়ে দিলেন। কোলের কাছ থেকে উলের গোলা, কাঁটা, সরিয়ে নিলেন যাবার সময়।

শুভেন সমস্ত দেখছিল। লণ্ঠনের ম্লান আলো যেন ম্লানতর হয়ে সুবর্ণর গায়ে পড়েছে। পিঠের ওপর কালো শাল। ফরসা জরা-জর্জরিত মুখে যেন কত তৃপ্তি মেশানো, অথচ এই তৃপ্তির কোথাও যেন এক বেদনার অস্পষ্ট স্পর্শ রয়েছে? কোথায়? চোখে? নাকি ওই চুল ওঠা সিঁথির সিঁদুরের ওপারে—পাকা চুলের আড়ালে যা আর দেখা যায় না।

মীনা হঠাৎ সুবর্ণকে বলল, আপনি মাসিমা, চোখে দেখতে পান না। তবু ওই উলের গোলা আর কাঁটা নিয়ে কী করছিলেন?"

সুবর্ণ বড় সুন্দর করে হাসলেন, "আজ আর দেখতে পাই না মা, বড় কষ্ট হয়। এককালে কত কী বুনতাম। উনি আমার বোনা ছাড়া জীবনে কখনও কিছু পরেছেন নাকি?...অভ্যেসটা তো রয়েছে মা, হাতে কাঁটা ধরলে ঠিক বুনতে পারি।"

"কী বুনছিলেন?"

সুবর্ণ একটু চুপ করে থেকে বরদাকান্তের দিকে আঙুল দেখালেন। "শীত পড়ে যাচ্ছে তো মা। আমার বুড়োর মাথায় চুল কই। ওর জন্যে একটা টুপি বুনতে বসেছি।"

মীনা হাসতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার হাসিটা গলার কাছে এসে পুঁটলি পাকিয়ে গেল। তারপর সমস্ত বুক টনটন করে উঠল। চোখে জল এসে গেল মীনার।

পাঁচ

জ্যোৎস্নাও মরে গিয়েছে। জানলার বাইরে অন্ধকার। ঠাণ্ডা আসছিল। মীনা পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে আছে। তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল শুভেন। চারপাশ জুড়ে যত ঝিঁঝি ডাকছে। অনেকক্ষণ আগে স্টেশনের দিক থেকে একটা গাড়ি চলে যাবার শব্দ ভেসে এসেছিল।

ঠাণ্ডাটা আর যেন সহ্য না হওয়ায় শুভেন বিছানায় বসে জানালা ভেজিয়ে দিল। আরও অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। ঘুটঘুট করছে।

কেমন যেন বিরক্ত হয়ে শুভেন বলল, "ঘুমোলে নাকি !"

মীনা সাড়া দিল না।

শুভেন স্ত্রীর গায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল। মীনা ঘুমোচ্ছে না। অথচ নিঃসাড়। শুভেন্দুও এতোক্ষণ ওইভাবেই শুয়ে ছিল। সাড়াশব্দ না করে।

এখন বিরক্ত লাগছে কেন? বিষণ্ণ লাগছে কেন? বুকের মধ্যে এই ভার কেন জমছে? কেন তার শরীর সাড়া পাচ্ছে না? শুভেন যেন ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠে নিজেকে স্বাভাবিক সচেতন করতে চাইল।

মীনার মুখে গাল ঘষল। চুমু খেল। কানে ফুঁ দিল। চোখের পাতায় জিবের আগা ছোঁয়াল। তারপর মীনার জামায় হাত দিল।

মীনা কোথাও কোনো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু তার নিজের দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। তার গায়ে আজ তেমন করে

কাঁটাও ফুটল না। পা গরম, হাতও উষ্ণ; তবু শুভেন্দু অনুভব করল, মীনার সেই ব্যাকুলতা, তপ্ততা নেই। তার চুমুতে নেশার সেই তাত নেই; লাবণাক্ত ও মিষ্টতার চেনা স্বাদও না।

শুভেনের মনে হল, ঠিক এখান থেকে সে ফিরে যেতে পারে না। ফিরে গেলে যেন তার হার স্বীকার হবে। এই যৌবন, এই শরীর—এখানে হেরে যেতে নারাজ! কেন হারবে?

ঠোঁটের কাছ থেকে ভেজা কড়ে আঙুলটা বের করে শুভেন মীনার কানের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল, যেন পালক দিচ্ছে কানে।

মীনা ঈষৎ কাঁপল।

"মিনু মিনু—" শুভেন আদর করে বার বার ডাকতে লাগল, ফিসফিস করে; চুমু খেতে লাগল, গলা বুক ভরে গেল চুমুতে। কোমর, পেছন, উরুতে বুঝি নখের আঁচড় লাগল।

শুভেনের ভার বুকে নিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে, শুভেন যখন আদরের শেষাশেষি—মীনা হঠাৎ বলল, "একদিন—আমি যখন বুড়ি হয়ে যাব—তুমি কী করবে?"

শুভেন বলল, "আমিও বুড়ো হব।"

"না, আমার কথা বলো! তখনও তুমি আমায় অমন করে ভলবাসবে?"

শুভেন বিন্দুমাত্র কিছু না বুঝেই বলতে যাচ্ছিল, বাসবো—বাসবো। তার আগেই তার সুবর্ণর সেই শাল জড়ানো, তৃপ্ত ও বিষণ্ণ মুখ যেন চোখের ওপর আটকে গেল।

শুভেন কেমন অসাড় হয়ে গেল। একেবারে নিশ্চল। ক্রমে তার শরীর কেমন উদ্যমহীন, আবেগহীন, ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল।

মীনা যেন কেমন দুঃস্বপ্নের মধ্যে কথা বলার মতন করে বলল,

"এত ভালবাসা—আমি আর দেখি নি।....একজন যদি আগে যায় —অন্যজনের কি হবে বলতে পার?"

শুভেন হঠাৎ যেন দেখল : বুড়ি চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে—খাটে শুয়ে, সাদা মাথায় সিঁদুর লেপা, গলায় গাঁদা ফুলের মালা। আর এই বেহারী গ্রামের মদনলালরা দড়ির খাটিয়া বয়ে নিয়ে চলেছে মাঠ ঘাট জঙ্গল দিয়ে। ভোমরার গুঞ্জনের মতন শব্দ উঠছে : রাম নাম স্যাত হ্যায়, রাম নাম স্যাত হ্যায়....। বরদাকান্ত পিছু পিছু চলেছেন। আস্তে আস্তে, একা একা, চোখ দুটি খাটের দিকে।

স্ত্রীর পাশে গড়িয়ে নেমে পড়ল শুভেন। বালিশে মুখ গুঁজল। সারা জীবন ধরে এত ভালবাসা বয়ে নিয়ে যাবার সাধ্য কি তার আছে?

শুভেন নিজেই বুঝতে পারল না—তার কাম কখন কান্নায় ধুয়ে যাচ্ছিল। বুকের মধ্যে, গভীরে, কোথাও শীতের বাতাসের শিস ধরানো তীক্ষ্ণ শব্দের মতন একটা হাহাকার করা ফোঁপানো কান্না পাক খাচ্ছে। খাচ্ছে।

আয়োজন

পশুপতি অফিস থেকে ফিরতেই মনোবীণা জিজ্ঞেস করল, "টিকিট পেয়েছ ?"

পশুপতি গায়ের জামাটা খুলে মনোবীণার দিকে এগিয়ে দিল। দেবার সময় বউয়ের থুতনি ধরে আদর করে নেড়ে দিয়ে বলল, "পেয়েছি।"

মনোবীণা স্বামীর হাত থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে কাঠের হ্যাঙারে ঝোলাল। আলনায় টাঙিয়ে রাখবে। টিকিট পাওয়া গেছে শুনে যেন মনোবীণার কত দুর্ভাবনা কেটে গেল।

পশুপতি খানিকটা পুরোনো ধরনের মানুষ। এখনও ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ; পায়ে নিউকাট চড়িয়ে অফিস যায়। তার পোশাক

ছিমছাম ; তাঁতের সাধারণ ধুতি, মাঝারি আদ্দির পাঞ্জাবি। বয়েস আটচল্লিশ হতে চলল। এখনও চুল পাকে নি ; পাকব পাকব করছে। দোহারা চেহারা, আধ-ফরসা গায়ের রঙ, মুখচোখ সামান্ত চৌকোনো।

মনোবীণা পাঞ্জাবি রেখে বলল, "আর ওইটে আন নি ?"

পশুপতি ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় গায়ে পাখার বাতাস লাগাতে সরে গেল, বলল, "না, আজ আর হল না।"

"টাকা ফুরিয়ে গেল ? আমি তোমায় গুনে গুনে পঞ্চাশ দিলাম....।"

"উহুঁ, টাকা ছিল", পশুপতি তার সাদা মাদ্রাজী লুঙ্গিটার জন্যে হাত বাড়াল। তারপর ইতস্ততঃ করে বলল, "তুমি কি সত্যি সত্যি বাড়িতে ও-সব ঢোকাবে ?"

মনোবীণা স্বামীর সাদা লুঙ্গিটা আলনা থেকে তুলে নিয়ে একবার ঝেড়ে নিল। "তার মানে ! আমি কি শখ করতে তোমার হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছিলাম। দিন দিন খিদে কমে যাচ্ছে, বাড়ি ফিরেই বলো—আর পারছি না, ক্লান্তি লাগে ; মাঝে মাঝে শুনি, ঘুম হচ্ছে না ভাল। তুমিই বলছিলে ওষুধ-বিষুধ টনিক-ফনিকে কাজ হয় না ; তার চেয়ে রোজ একটু ওই খেলে ভাল হয়—।"

স্ত্রীর হাত থেকে লুঙ্গিটা নিল পশুপতি। "এখন তো বলছ ভাই, তারপর দু-দিন পরে বলবে, আমি বাড়িতে মদ ঢুকিয়েছি।"

"আহা রে, সোনার চাঁদ কিনা তুমি। বাইরে আর ও-জিনিস খাও না !"

"সে ন-মাসে ছ-মাসে এক-আধ দিন ; তাও বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে।"

"থাক, আর বন্ধু-বান্ধব দেখিও না।....এবার না হয় বউয়ের পাল্লায় পড়ে খাও।"

"আমার আর কি, খেতেই পারি। পরে তোমায় কাঁদতে হবে।"

"কাঁদার বয়েস পেরিয়ে গেছে গো! কচি বউ হতাম, বয়স কম হত, বর বাড়ি ফিরে মাতলামি করত, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতাম। চল্লিশ বছরের বুড়ী আমি, আমার আর কাঁদার কিছু নেই। তোমাকে বাপু সুস্থ রেখে যেতে পারলেই বাঁচি।"

লুঙ্গিটা পরে ফেলেছিল পশুপতি। ধুতি মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে স্ত্রীর হাতে দিল। ঠাট্টা করে বলল, "রেখে তো যাবে বলছ, কিন্তু কার কাছে রাখবে? বকুলের মার কাছে?"

মনোবীণা কাপড় গোছাতে গোছাতে বলল, "তোমার কি মুখ! বাড়ির ঝি নিয়ে ঠাট্টা! ঘেন্না হয়।"

পশুপতি জোর হেসে ফেলল। "শোনো ভাই মনো, আমি যদি হুইস্কি খাই—দেশী হুইস্কি, তা হলে কিন্তু মুখে বেশ গন্ধ হবে।"

আলনার কাছে সরে গেল মনোবীণা; বলল, "থিয়েটারের কত টাকার টিকিট পেলে?"

পশুপতি বলল, "দশ টাকার। পাঁচ-সাতখানাই আর ছিল।"

মনোবীণা আর দাঁড়াল না; বলল, "মুখেচোখে একটু জল দিয়ে এসো, চা আনছি।"

পশুপতি পাখার তলায় আরও একটু দাঁড়িয়ে থাকল। ঘাম শুকিয়ে এসেছে। দেরাজের দিকে তাকাতেই পুরোনো চৌকোনো টাইমপিস ঘড়িটা চোখে পড়ল। পৌনে সাত। কাল এতোক্ষণ থিয়েটারে।

পশুপতি থিয়েটারের ভক্ত। আজ তিরিশ বছর সে থিয়েটার দেখছে। বেশীও হতে পারে। শিশির ভাদুড়ি, দুর্গাদাস, ছবি বিশ্বাস—কিছুই তার বাদ যায় নি। আজকালকার থিয়েটার তার তেমন ভাল লাগে না। তবু নেশা। মন ভরে না, তবু যায়। আর পশুপতি নানারকম অভিজ্ঞতা থেকে ধরে নিয়েছে, শনিবারের

দিনটাই থিয়েটার দেখার ভাল দিন। বৃহস্পতিবারে থিয়েটার-অলারা বাড়ির লক্ষ্মী পুজোর মতন নমো নমো করে 'প্লে' সারে; আর রবিবার ডবল খেপ। আজকালকার সিনেমা-করা থিয়েটারের ছেলেগুলোর দমই থাকে না তো ডবল খেপ মারবে! শনিবারটাই ভাল।

বউয়ের কাছে এই সব গল্প বলে পশুপতি: শিশির ভাদুড়ির গল্প, দুর্গাদাসের গল্প, শান্তি গুপ্তা আর রানীবালার গল্প। গল্প শুনিয়ে বলে, "তুমি তো আর এ-সব দেখলে না ভাই মনো, কী সব অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ছিল তখন।...এখন তেমন অ্যাক্টর কই!"

পশুপতি তার বউকে সোহাগ করে 'মনো' বলে 'ভাই' বলে, আরও অনেক কিছু বলে।

মনোবীণা কলকাতার মেয়ে নয়। আসানসোলের দিকে কোলিয়ারীতে তার বাবা ম্যানেজারীর চাকরী করত। পাঁচ ঘাটের জল খেয়ে সে মানুষ। বেচারী আর কোথ্ থেকে কলকাতার থিয়েটারের খোঁজ রাখবে। বিয়ের পর পাকাপাকিভাবে সে কলকাতায়, এই হরি মিত্তির লেনের বাড়িতে। নয় নয় করেও আজ সতেরো আঠারো বছর কেটে গেল এই বাড়িতে। এই আঠারো বছরে শ্বশুর গিয়েছেন, শাশুড়ী গিয়েছেন গ্রহণের স্নান সারতে গিয়ে বাগবাজারের গঙ্গায়। এক ননদ ছিল, বিয়ের পর নাগপুর ছাড়িয়ে আরও দেড়-শো দু-শো মাইল দূরে চলে গেছে। বাপের বাড়ির তরফেও যে যার মতন মায়া কাটিয়ে চলে গেছে, যারা আছে তারাও নিজেদের সামলাতে অতিষ্ঠ। আঠারো বছর বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের আর বাপের বাড়ির কী থাকে। কিছুই নয়! কাছাকাছি থাকলে তবু হয়তো মুখ দেখাদেখি চলত, দূর পড়ে যাওয়ায় সেও বছরে এক-আধবার হয় কি হয় না।

শ্বশুরবাড়িতে মনোবীণার এখন স্বামী ছাড়া কেউ নেই, কিছু

নেই। বাইশ বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল মনোবীণার। পঁচিশ বছরে একবার সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল; মাস-সাতেকের মাথায় সেটা নস্ট হয়ে যায়। এই হরি মিস্ত্রির লেনের বাড়িতে, ওই দোতলার সিঁড়ির মুখে সে পা পিছলে পড়ে যায়। তিন-চার ধাপ শুধু গড়িয়ে গিয়েছিল। তাতেই যা যাবার গেল। তারপর থেকে মনোবীণার আর কিছু হয় নি। ডাক্তার বদ্যি অনেক করেছে, ওষুধ খেয়েছে কতরকম, কিউরেট করিয়েছে, কিছু হয় নি। মাদুলি আংটিও পরেছে মনোবীণা, সাধু-সন্ন্যাসীর পায়ে পূজো দিয়ে এসেছে। কই কিছুই হল না।

মনোবীণার বয়েস এখন চল্লিশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সে বেশ জানে, ছেলেপুলে হবার স্বাভাবিক বয়েস এটা নয়; এখন কিছু ঘটা মানে যমে-মানুষে টানাটানি। মনে মনে আর নিশ্চিত কোনো আশাও রাখে না। তবু এখনও সে কোনো কোনো মাসে হঠাৎ কেমন সচেতন হয়ে ক্যালেণ্ডারে তারিখ দেখে। দেখে আর দেখে। অপেক্ষা করে, হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, রাত্রে ঘুমন্ত স্বামীর পাশে শুয়ে কত-রকম কি ভাবে, সারা দিন সতর্ক হয়ে শরীর বাঁচায়। তারপর যখন তার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেই ঘটনাটা ঘটে যায়—তখন তার দু-চোখ ভরে জল আসে, নিজের ওপর আক্রোশ হয়, ঘৃণা জাগে। পশুপতির সঙ্গে তার সেদিন তুমুল হয়ে যায়। অথচ মনোবীণা জানে, তার স্বামীর কোনো দোষ নেই। দোষ তার নিজের শরীরে। তবু, মনোবীণা ভাবে, একবার যখন হয়েছিল, আচমকাই হোক বা আকস্মিক হোক, তখন তো আবার হতে পারে। কেন হয় না?

এক-এক দিন মন যখন এই সব কারণে উতলা থাকে, মনোবীণা তখন ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে তার প্রত্যাশিত দিনের পরও প্রতিটি বাড়তি দিনকে রত্নের মতন মুঠোয় ধরে থাকে—দিন যায় দিন যায়, আর তারপর আচমকা সেই জিনিস ঘটে যায়—তখন মনোবীণার মনে হয়, তার হাত থেকে সব রত্ন জলে পড়ে গেল।

হাত ফাঁকা, অসাড় নিঃস্ব। তখন সে কী যেন প্রচণ্ড আক্রোশে দোতলার সেই সিঁড়ির মুখ—যেখান থেকে পা পিছলে একদিন পড়ে গিয়েছিল সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিরাগে, ঘৃণায়, প্রচণ্ড জ্বালায়। কত বছর আগে সে ঘটনা ঘটে গেছে—বছর পনেরো, তবু মনোবীণার কেন যে এই অদ্ভুত রাগ।

পশুপতি বসে ছিল, মনোবীণা চা জলখাবার নিয়ে ঘরে এল।

"তুমি কাল অফিস থেকে ফিরবে কখন?" মনোবীণা জিজ্ঞেস করল।

"তিনটে নাগাদ, শনিবার তো!"

"তাসে বসবে না?"

"মাথা খারাপ। তোমার থিয়েটার।"

"এর বেলায় আমার! যখন নিজে টেনে নিয়ে বেরোও তখন দোষ থাকে না।"

পশুপতি পরোটার সঙ্গে আলুভাজা তুলে মুখে দিল, চিবোতে লাগল। তারপর বলল, "দোষ দিচ্ছি না, ভাই। বলছি হুকুম। তোমার হুকুম মানবো না এমন ক্ষমতা আমার নেই।"

"আহা, কি আমার বাধ্য?"

"তোমার বাধ্য না হলে কার হব! তুমি আমার বউ, বোন, ভাই, মা, বাবা সব সর্বস্ব। অলমাইটি।"

মনোবীণা হেসে ফেলে চোখের কটাক্ষ করল, বলল, "তোমার ইয়েটি—" বলে বুড়ো আঙুল দেখাল।

পশুপতি হাসিমুখে স্ত্রীকে দেখছিল।

মনোবীণা আর পশুপতির একটা যুগল ছবি আছে এ ঘরে। দেওয়ালে ঝুলছে। বিয়ের ঠিক পর পর তোলা না হলেও কিছু পরে তোলা। ওই ছবির মনোবীণা ছিল রোগা-রোগা, টল্‌টলে চোখ ছাড়া মুখের আর কোথাও ভরা-ভারন্ত ভাব ছিল না। আজকের মনোবীণা

অন্যরকম; চেহারা ভারিক্কি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তেমন বিসদৃশ ভারী নয়, গড়নের মধ্যে ভোঁতা ভাব আসে নি, মোটামোটি গড়ন ঠিকই আছে। মুখ সামান্য গোল ধরনের, নাকটি মাঝারি, চোখ টানা টানা—; কিন্তু চোখের পাতা আর গালের কোল ফুলে থাকার জন্যে কম বয়েসের টলটলানি নেই। মনোবীণার মাথার চুল কোনো কালেই খুব কালো ছিল না, আজ আরও কটা ধরনের কালচে। তবে চল্লিশ বছরের অনুপাতে তার মাথায় এখনও যথেষ্ট চুল, খোঁপা বাঁধতে অসুবিধে হয় না। কানের পাশে, কপালে মাথার চাঁদির দিকে দু'দশটা রূপোলী চুল চোখে পড়ে হয়তো। তা পড়ুক। তবু এই যে মনোবীণার চেহারা, তাতে বয়েস থাকলেও তার ভার কিংবা ভাঙন এখনও স্পষ্ট করে চোখে পড়ে না। হাত-পায়ের মাংস কেমন শক্ত রয়েছে, গলা কিংবা ঘাড়ের চামড়া কুঁচকে যায় নি। এখনও বুক নেমে আসে নি, ভারী এবং পুর্ণ হয়েও সবল, কোমড়ে পেটে বেয়াড়া চর্বি তার জমলো না, পেছনের দিক থেকেও তাকে শক্ত দেখায়, মনে হয় না চল্লিশ বছরের গেরস্থ বাঙালী বাড়ির বউ। কাদার মতন গলে না গিয়ে মনোবীণা এখনও শরীরটাকে মজবুত শক্ত রাখতে পেরেছে।

পশুপতির ধারণা, ছেলেপুলে না হবার জন্যেই তার বউয়ের শরীর বা গড়ন এখনও টিকে আছে। বাচ্চাকাচ্চার ধকলে মেয়েদের শরীর ভেঙে যায়, বুক-টুক নষ্ট হয়ে যায়, পেছন-টেছন থপ্‌থপে হয়ে পড়ে। মনোবীণার সে সব ঝঞ্ঝাট এল না জীবনে। তা ছাড়া তার বউ বড় কাজের, শুয়ে-বসে গড়িয়ে সময় কাটাতে পারে না। বকুলের মা বাসনমাজা ঘর-মোছার কাজটুকুই যা করে, বাকি সব মনো নিজের হাতে, রান্না-বান্না থেকে যাবতীয় যা কিছু। হাতের কাজও কম জানে না, শীত পড়লেই কত যে আলতু-ফালতু বুনে দেয় পাড়ার লোকের, মেয়েরা এসে জামার ছাঁটকাঁট করিয়ে নিয়ে যায়

হরদম। দুপুরে ঘণ্টা দেড়-দুই শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়া ছাড়া মনোকে আলস্য করতে পশুপতি দেখে নি।

অবশ্য তাদের সংসার আর কতটুকু! দু-জন মানুষ। এই দু-জন মানুষই তো এতোটা কাল পরস্পরের ওপর নির্ভর করে, পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে কাটিয়ে এল। এইভাবেই তারা এক জন অন্য জনের বিদায় পর্যন্ত কাটাবে। তারপর কী হবে—কেউ জানে না। ভাবতে গেলে মন এত মুষড়ে পড়ে যে পশুপতি ও সব ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চায় না।

চায়ের কাপ মুখে তুলে পশুপতি স্ত্রীর দিকে কেমন মমতার চোখে তাকাল, বলল, "তুমি চা খাবে না?"

"আনছি।"

"যাও নিয়ে এসো, আমার ভাই তোমাকে ফেলে কিছু করতে ইচ্ছে করে না।"

"আহা, ঢঙ··! যখন বন্ধুদের সঙ্গে তাস নিয়ে বসো তখন মনোর কথা কত মনে পড়ে ভাই!"

"এই দেখো. কী মিথ্যে অপবাদটাই দিচ্ছ! শনিবার দিনটাই যা অফিসে একটু কল্যাণদের সঙ্গে বসি। তাও তোমার পোষা ইয়ের মতন সন্ধ্যের আগেই গোয়ালে ফিরে আসি।"

মনোবীণা এই বয়সেও স্বামীকে বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে জিব বের করে ভেঙাল।

পশুপতি একলা। মনোবীণা চা আনতে গেছে। নিজের চায়ের স্বাদটাও চমৎকার লাগছিল পশুপতির। মনো জানে, পশুপতি একটু শৌখিন ধাতের মানুষ। ভাল চা, মোটামুটি ভাল সিগারেট, অল্প কিন্তু পাঁচ রকম ব্যঞ্জন খেতে ভালবাসে। স্বামী যা ভালবাসে মনো সমস্ত করে। স্বামীর কাপড়-জামা নিজের হাতে ধোয়া থেকে শুরু করে পায়ের জুতোটি পর্যন্ত রোজ ঝেড়ে মুছে কালি

লাগিয়ে রাখে। আর পশুপতিও জানে, সে অফিস বেরোনোর পর থেকে যতক্ষণ না বাড়ি ফিরছে মনো হাঁ করে বসে থাকে। সারা দিনের মধ্যে এই আট-দশ ঘণ্টা যা বিচ্ছেদ, নয়তো তাদের মধ্যে আর কোনো ছেদ নাই। সকালের দিকটায় তাড়া থাকে মনোবীণার, পশুপতিরও অফিস যাবার তাড়া, দু-জনের মধ্যে হাসি-তামাশা, রগড়, পেছনে লাগা তেমন হয় না। তাদের যা কিছু এই সন্ধ্যের পর। কোনদিন ঘরে বসে শুধুই গাল-গল্প, কোনদিন দাবা নিয়ে বসে পড়ল স্বামী-স্ত্রী, কোনদিন চলল সিনেমায়, কোনদিন থিয়েটারে। আবার কখনও দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলে যায় বেড়াতে।

মনোবীণার সাধু-সন্ন্যাসীর বাতিকটা আগে তেমন ছিল না; সেটা মাঝে বেশ বেড়ে গিয়েছিল। আবার কমে যায়। তবে হালে আবার বাড়ছিল।

পশুপতি এ সব পছন্দ করে না। সে দেব-দ্বিজ নিয়ে মাথা ঘামায় না। হিন্দুর ছেলে, ঠাকুর-দেবতা প্রণাম করতে তার আপত্তি নেই। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দুদণ্ড বসতেও তার অনিচ্ছা দেখা যায় না। কিন্তু গেরুয়া দেখলেই ছোট, আর মাদুলি তাবিজ পরো —এতে তার আপত্তি। স্ত্রীকে পশুপতি বুঝিয়েছে; বলেছে—'তোমার এখনও এত আফসোস কেন মনো, যা হয় নি তা মেনে নাও; সংসারে সকলের সব কিছু হয় না। আমাদের অফিসের একটি মেয়ের স্বামী মারা গেল বিয়ের দু-বছরের মাথায়, বাচ্চাকাচ্চাও নেই। আরও তো বছর তিন কেটে গেল, কই মেয়েটি আবার বিয়ে বিয়ে করে কেঁদে মরছে না তো! বিধবা হয়ে থাকার দুঃখ ছেলেপুলে না হবার চেয়ে কি বেশী নয়?....তা ছাড়া, তোমার বয়স হয়েছে, আমি বুড়ো হতে চললাম, এখন কিছু না হওয়াই মঙ্গলের। আমি ভাই স্পষ্ট বলছি, আমি বউ হারাতে রাজী নই, ছেলেপুলে শালা চুলোয় যাক, আই ডোণ্ট কেয়ার।'

মনোবীণা বোঝে, আবার বোঝেও না। মাঝে মাঝে হঠাৎ তার মাথার পোকা নড়ে ওঠে।

ততক্ষণে মনোবীণা চা নিয়ে ফিরে এসেছে।

পশুপতি হঠাৎ বলল, "হ্যাঁ ভাই মনো, তোমার সেই ইচ্ছাময়ী মা'র কি হল? সিঁথি ছেড়ে পালিয়েছেন? না এখনও আছেন?"

মনোবীণা বিছানার দিকে সরে গিয়ে বসল। স্বামীকে দেখল। বলল, কেন?'

"জিজ্ঞেস করছি।"

"হঠাৎ?"

"বাঃ তুমি না যাও সেখানে।"

"বাজে কথা বলো না", মনোবীণা রাগ করে বলল, "বার দুই-তিন গিয়েছি। প্রথমবার তোমার প্রাণের বড়দি নিয়ে গিয়েছিল।"

বড়দি মানে এই পাড়ার মাধুরীদি। পশুপতি ছেলেবেলা থেকেই বড়দি বলে আসছে। সবাই বলে পাড়ার। তিনি প্রবীণা। বড়ই ধর্মপ্রাণ, অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসী। হাঁপানিতে ভুগে ভুগে মরছেন, এখন তাকতুক করে শারীরিক কষ্টটা বাঁচাতে চান।

পশুপতি বলল, "আহা, রাগ করছ কেন? ইচ্ছাময়ী মা তো ভালোই, বাবারা হলে আমার আপত্তি থাকতো।"

"তোমার সব তাতেই অবিশ্বাস।"

"মোটেই নয়। তোমার ওপর আমার যে কী বিশ্বাস তা যদি দেখাতে হয় ভাই, তা হলে হনুমানের মতন বুক চিরতে হয়। বুক চিরলে দেখবে সেখানে শুধু মনো মনো লেখা।" বলতে বলতে পশুপতি প্রাণ খুলে হেসে উঠল।

দুই

থিয়েটারে তখন নাচ চলছিল। টানা এক ঘণ্টা বসে থাকার পর তবে নাচ এল। চারপাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, এই যে একটা ঘণ্টা সময়—এ যেন স্টেশনে গাড়ির অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে বসে থাকার মতন, যেই গাড়ি এল সকলেই চঞ্চল হয়ে পড়ল, পড়িমরি করে ছুটল জায়গা দখল করতে। অবশ্য এটা গাড়ি নয়, থিয়েটাব ; কাজেই হুড়োহুড়ি করে ছোটার উপায় নেই। কিন্তু অনেকটা সেই রকম চাঞ্চল্য। বিলাতী ঢঙের প্রবল বাজনার সঙ্গে বিলাস-নৃত্য। আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে, স্থির থাকছে, আবাব সবাসরি নৃত্যময়ীকে প্রখব, স্পষ্ট উজ্জ্বল করে তুলছে।

পশুপতি লক্ষ্য করে দেখল, নাচ শুরু হবার পর—পেছন থেকে কিছু কিছু অস্পষ্ট ধ্বনি ও গুঞ্জন ভেসে এল, কদাচিৎ দু-একবার ছোকরা বকাটে গলার উল্লাস। তার আশেপাশে কেউ কেউ, স্বামী-স্ত্রী হোক অথবা না হোক, ফিসফিস করে কানে কানে কিছু বলাবলি করল, পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল, দৃষ্টি সরাল, আবার নাচের দিকে চোখ বাখল। 'এ সব যে কি হয়' বলার পরও চক্চকে চেহারায় এক ভদ্রলোক পাশের মহিলার কোলের ওপর হাত রাখল।

মনোবীণা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল, যেন লক্ষ্য করল পশুপতি কী নজরে নাচটা দেখছে। সামান্য হেলে গেল স্বামীর দিকে, কাঁধে কাঁধ স্পর্শ করল, পায়ের চটি থেকে আস্তে আস্তে করে পা বেব করল, করে স্বামীর পায়ের ওপর আলতো করে পা রাখল।

পশুপতি নস্যির গন্ধ পেল। কেউ হয়তো ঝাঁঝালো অবস্থায় নস্যি টেনে নিচ্ছে। একটি মেয়েলী গলা বেফসকা বলে ফেলল, 'কোমরে চর্বি লেগেছে।' বলেই চুপ করে গেল।

মনোবীণা সামান্য উসখুস করে কানে কানে কথা বলার মতন কী যেন বলল।

পশুপতি স্ত্রীর দিকে তাকাল।

"তা হলে?" পশুপতি নীচু গলায় শুধলো।

"চলো চলে যাই।"

"এখন কেমন করে বেরুবো। এটা শেষ হোক।"

নাচ শেষ হবার পর বিরতি। পশুপতি স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরের ভিড় কাটিয়ে এসে পশুপতি বলল, "তুমি মাইরি কী! শেষের দিকে আরও নাকি দুটো জবর নাচ আছে।"

"আহা, খুব যে....।"

"আমায় বলছ কেন, এই থিয়েটার তুমিই দেখতে চেয়েছিলে। রেগুলার তাগাদা মেরেছ।"

মনোবীণা সে কথার কোনো জবাব দিল না। "কটা বেজেছে?"

ঘড়ি দেখল পশুপতি। "আটটা বাজতে পাঁচ।"

"রিকশা নাও।"

কয়েক পা এগিয়ে পশুপতি রিকশা নিল। রিকশায় চেপে বউকে বলল, "কলকাতায় কিছু স্পেশ্যাল রিকশা থাকা দরকার কি বলো, আমাদের মতন দু-জনের সাইজের জন্যে....।"

মনোবীণা স্বামীকে কনুই দিয়ে ছোট করে গুঁতো মারল, "নাচ দেখে বুঝি ওই রকম ছিপছিপে চাইছ?"

"না ভাই, এ বয়সে ছপছপেই চাইছি।"

রিকশাঅলা এগুতেই মনোবীণা বলল, "বাজারের দিক দিয়ে যেতে বলো ওকে।"

"বাজার দিয়ে? দেরী হয়ে যাবে তো!"

"হোক।"

"না—মানে তুমি সামলাতে পারবে?"

"পারব।"

পশুপতি রিকশাকে বাজার দিয়ে যেতে বলল।

আকাশে মেঘ করেছে যেন। যদিও এটা বর্ষার শেষ, শরৎ চলছে, তবু কটা দিন খটখটে যাচ্ছিল। গরমও পড়েছিল। আজ সকাল থেকেই ঘোলাটে, মেঘলা-মেঘলা গিয়েছে। বাদলার গন্ধ এখন ভেসে আসছে আস্তে আস্তে; হয়তো এক পশলা নামবে। হাওয়াও দিয়েছে।

পশুপতি যেন আচমকা বাদলার গন্ধ নাকে টানতে টানতে গিয়ে স্ত্রীর কাঁধের কাছ থেকে কোনো সুঘ্রাণ পেল। বার দুই নাক টানল।

"কী মেখেছ গো?"

"কিছু না। সেই সেণ্টটা....।"

"খসের গন্ধ না? বেশ লাগে।"

পশুপতি হঠাৎ কেমন সচেতন হয়ে স্ত্রীকে লক্ষ্য করল। কখনো কখনো এমন হয়—আগে যা নজরে আসে নি আচমকা তা নজরে এসে যায়। পশুপতির সেই রকম হল; দেখল: মনোরমা আজ সিল্ক পরেছে, সচরাচর যা পরে না; তাঁত তার পছন্দ—বলে, এ বয়সে আমাদের কি আর অত ছোপ-ছাপ রঙ ভাল লাগে—বুড়ী হয়ে গেলাম। সেই বুড়ী আজ ফিরোজা রঙের সিল্ক পরেছে, পাড়টা কী সুন্দর—অথচ একেবারে ঢালা, কোনো কারুকার্য নেই। গায়ের জামাটা শাড়ির রঙের। মনোবীণা যেভাবে শাড়ির আঁচল কাঁধের

কাছে বার বার টেনে হাত ঢাকছিল—তাতে এবার পশুপতির নজরে পড়ল, তার বউ বগল-কাটা জামা পরেছে। সর্বনাশ, মনোবীণা করেছে কি? এ ধরনের জামা দু-একটা করিয়েও সে পরে নি।

পশুপতি ঠাট্টা করে বলল, "ভাই মনো, তুমি আজ সারপ্রাইজ দিচ্ছ!"

"কেন?"

"এই ড্রেস! ওই ব্লাউজ!"

"নিজের হাতে তৈরী করেছি মশাই, তোমরা তো এসব দেখতে ভালবাস।"

"তোমায় আমি এত ভালবাসি যে তুমি যাই পরো, না-পারো আমার কিছু এসে যায় না।"

মনোবীণা স্বামীর হাঁটুর কাছে চিমটি কেটে দিল।

পশুপতি হাসতে লাগল। মনোবীণার গায়ের রঙ মন্দ নয়। আজ তার মুখ আরও ঝকঝকে অথচ মোয়ালেম দেখাচ্ছিল। চোখ টান টান। মাথার খোঁপাটা বেশ বড়।

না, বৃষ্টি বোধ হয় এসেই যাবে। বাদলার গন্ধ বেশ নাকে লাগছে। সামান্য ধুলো উড়ল, কাগজ-টাগজ, পাতা উড়ছে, লোকজন আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তায় শনিবারের সেই ভিড়।

বাজারের মুখে এসে মনোবীণা বলল, "এই, ওই দেখো ফুল।"

"ফুল! ও, নেবে?"

"নিতে পার।"

"তা হলে নামি।"

"নামবার কি আছে? ফুলঅলাকে ডাকো। রিকশাটা একটু পাশ করে থামাক।"

রিকশা থামিয়ে ফুল কিনল মনোবীণা, বেলের মালা, খোঁপায় পরবে। রজনী গন্ধার ঝাড় নিল ডজন দুই।

আবার রিকশা চলতে লাগল।

"কটা বাজল গো ?"

ঘড়ি দেখল না পশুপতি। বলল, "আটটা দশ-পনেরো হবে।" বলে একটা সিগারেট ধরাল। স্ত্রীর গায়ের গন্ধ, বাদলার গন্ধ, ফুলের গন্ধ সব যেন মিলে-মিশে বিচিত্র এক গন্ধ তৈরী করছিল।

রিকশা চলেছে—চলছে, ট্যাক্সি গেল, একটা বাস কান কালা করে চলে গেল পাশ দিয়ে, বাতি নিবছে দোকানের, শেষ বেলায় হকাররা বাক্স গুছোচ্ছে, যেতে যেতে মনোবীণা স্বামীর হাঁটুর কাছে হাতরেখে চাপ দিল। "এই ?"

"কী ?"

"তুমি তো কষা মাংস খেতে ভালবাস !"

"বাসতাম। কেন ?"

মনোবীণা একটু চুপ করে থেকে বলল, "রাগ করবে না ?"

"রাগের কী আছে ! ব্যাপারটা কী ?"

"তুমি তো আজ ওইটে খাবে। আমি বলছিলাম—একটু কষা মাংস ওই পাঞ্জাবীর দোকান থেকে নিয়ে নাও না। বাড়িতে মাংস-টাংস নেই। তুমিই বলো—ওই সবের সঙ্গে একটু মাংস খাওয়া ভাল।"

"ও ! আচ্ছা !....তুমি খাবে মাংস ?"

"খাবোখন একটু।"

"কিন্তু মাংস নিতে হলে দেরী হবে একটু। তোমার আবার অতক্ষণ....। ফ্যাসাদে পড়ে যাবে।"

"কিছু হবে না। তুমি যাও।"

রিকশাঅলাকে পশুপতি রসিকতা করে বলল, "তোকে বাবা

বেশী পয়সা দেব আবার একটু পাশ করে দাঁড়া। আমার বউয়ের কষা খেতে সাধ হয়েছে। লক্ষী বাবা আমার, বউ কি জিনিস, জানিস তো।"

রিকশাঅলা আবার রিকশা দাঁড় করাল এগিয়ে, একপাশে। পশুপতি নেমে গেল। মিঠে পানও আনতে বলল মনোবীণা।

মনোবীণা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। তারপর আকাশের দিকে তাকাল। একটাও তারা চোখে পড়ছে না। মেঘ হয়েছে। দূরে কোথাও মেঘ ডাকল। এই জায়গাটা সামান্য ঝাপসা। দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে আশে-পাশের।

এখন কটা বাজল? আটটা কুড়ি না পঁচিশ? সাড়ে আটটা কী? অনেক সময় রয়েছে হাতে, অনেক।

থিয়েটারের নাচ মনে পড়ল মনোবীণার। ওই পোশাক, ওই নাচ! অত সব আলো। কত বয়েস হবে মেয়েটার? তিরিশের কাছাকাছি হতে পারে। বোঝা যায় না। শরীর রেখেছে কত যত্ন করে। পেট চালাবার জন্যে না রেখে উপায় কি! যতই বলো, উরু ভারী ভারী লাগছিল, পায়ের গোছ কিন্তু বেশ। কোমর বাপু এমন কিছু সরু নয়। পেছনটা টনটনে। হাত-টাত কিন্তু তেমন একটা খেলানো নয়।

পশুপতির কেমন লাগছিল? মনোবীণা চোরা চোখে যতবার স্বামীর দিকে তাকিয়েছে, দেখেছে—পশুপতি কৌতূহল ও সামান্য লোভী-লোভী চোখে নাচের মেয়েটাকে দেখেছে।

মনোবীণা মনে মনে হাসল। দেখুক না, দেখুক। দেখার জন্যেই তো।

তিন

বাড়ি ফেরার পর পরই বৃষ্টি নেমে গেল।

বাতি জ্বালিয়ে পাখা চালিয়ে দিল মনোবীণা, বলল, 'জানলা খুলো না—ওদিকে ছাট রয়েছে।' বলে ফুলগুলো দেরাজের মাথায় রাখল। বেলের মালা ড্রেসিং টেবিলে।

পশুপতি হাতের কষা মাংসর ভাঁড়টা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বলল, "দারুণ গন্ধ দিচ্ছে মাইরি।"

মনোবীণা এগিয়ে এসে ভাঁড়টা নিল। বলল, "তা তো দেবেই, এখন বাবুর কত গন্ধই দেবে। যাকগে, জামা-কাপড় ছেড়ে ওটা খোল। আমি বাথরুম থেকে আসছি।"

মনোবীণা চলে গেল।

পশুপতি সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে গায়ের জামাটা খুলতে লাগল। খোলার সময় বুক পকেট থেকে খুচরো টাকার সঙ্গে থিয়েটারের টিকিট দুটো মাটিতে পড়ল। মেঝে থেকে টাকা কুড়োবার সময় টিকিট দুটোর ছেঁড়া অংশ কুড়িয়ে নিল। একেবারে জলে গেল টাকাটা। মনোর যা কাণ্ড! হবার হ'—এই সময়ে হুস করে হয়ে গেল। মেয়েদের ব্যাপারই আলাদা।

জামা খুলে আলনার পাশে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রেখে পশুপতি কাপড়-টাপড় পালটে নিয়েছে এমন সময় মনোবীণা ঘরে এল।

মনোবীণা বলল, "না গো, কিছু নয়।"

পশুপতি স্ত্রীর দিকে তাকাল। সামান্য যেন অবাক। "কিছু নয়?"

মাথা নাড়ল মনোবীণা।

"যাঃ, কুড়িটা টাকা একেবারে জলে চলে গেল! তুমি মাইরি যা কাণ্ড করো, তোমার জন্যে অমন সব লাচ-ফাচও দেখতে পেলাম না।"

"বাঃ, তা আমি কি করব! মনে হল—তাই বলেছিলাম।"

"মনে হল—! তুমি ভাই মেয়ে হয়েছিলে কেন? ইয়ের ব্যাপারটাতেই এ রকম মনে হয় কেন?" রঙ্গ করে পশুপতি বলল।

মনোবীণা নকল ধমক দিয়ে বলল, "নিজে একবার মেয়ে হয়ে দেখলে পার, কি মনে হয় আর না হয়! যাও, বাথরুম থেকে ঘুরে এস!...ওটা বের করে দেব?

"দাও।"

পশুপতি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মনোবীণা বেশ হালকাভাবে একবার জানলার দিকে গেল। এই বৃষ্টিতে সত্যি সত্যি তেমন কিছু ছাট আসার কথা নয়। তবু জানালা বন্ধ থাকাই ভাল। খোলা থাকলেই তুলসীদের বাড়ি থেকে এই ঘরের কিছু না কিছু চোখে পড়ে, পরদা থাকা সত্ত্বেও। বাদলা বাতাস আর পাখার হাওয়ায় ঘর এখন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। মনোবীণা প্রথমে দেরাজের মাথা থেকে রজনীগন্ধার ডাঁটিগুলো নিয়ে সাজাল। দেরাজের মাথায় রাখল কটা, পুরোনো ফুলদানিতে। বাকি কটা কাচের গ্লাসে করে ড্রেসিং টেবিলে রাখল। কাঠের ভারী আলমারি খুলল। আলমারির মাথার ওপরই চাবির গোছা পড়ে ছিল। বোতলটা বার করল। চ্যাপটা ছোট বোতল। বড়োয় দরকার কি! বেশী ভাল না। বোতলের মধ্যে হালকা সোনালী রঙের জলো জিনিসটা দেখল। লেবেল পড়ল। সীল করা বোতলের ওপরই নাক রেখে বার দুই টানল।

তারপর আলমারির মধ্যে আবার তাকিয়ে থাকল। শাড়িগুলো দেখতে লাগল। তাঁতের শাড়িই বেশী, হালকা রঙেরই যত শাড়ি।

সিল্ক অল্প ; নাইলন মাত্র গোটা তিন। তার মধ্যে ছাপ-ছোপঅলা দুটো। একটাই মাত্র একেবারে প্লেন, ঘন নীল রঙের। কী মনে করে মনোবীণা ওই শাড়িটাই বার করে নিল। নিয়ে আলমারির অন্য তাক ঘাঁটতে লাগল, জামাটা যেখানে থাকে। ঘেঁটে ঘেঁটে গোটা চারেক নীচের জামা বার করল। দুটো মামুলি ছাঁটের অবশ্য ভাল কাপড়ের ভাল ইলাস্টিকের। অন্য দুটোর মধ্যে একটা কালো, সিল্কের। অন্যটার বুকের কাছে লেসের কাজ, তলায় নেট, কাপড়টুকু নাইলন। মনোবীণা লেসের কাজ করাটাই পছন্দ করে নিল।

আলমারি বন্ধ করে মনোবীণা ড্রেসিং টেবিলের দিকে সরে আসতেই পশুপতি ঘরে এল।

"বাইরে খুব বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, রাত্রে কলকাতা ভাসাবে", পশুপতি বলল, একটু থেমে মুখ মুছতে মুছতে সরে এল "ভাসাক। কাল রবিবার। শালা খিচুড়ি আর ইলিশ-মাছ লাগিয়ে কর্তাগিন্নী ঘুম মারব। দাও, চিরুনিটা দাও একবার।"

চিরুনি দিল মনোবীণা। "হ্যাঁ গো তোমায় কী কী দেব ?"

"কিসের ?"

মনোবীণা হুইস্কির বোতলটা দেখাল।

সেরেফ জল দাও, সোডা-টোডা তো নেই। জল দাও আর কাঁচের গ্লাস।....তুমি একটু টেস্ট করবে নাকি ? তাহলে দুটো গ্লাস এনো।"

"আমার টেস্ট করে দরকার নেই ; তুমি করো।"

"আমি তো করবোই ; রক্তের গন্ধ পেলে বাঘ কখনো ছাড়ে ভাই !"

"বাঘ না শেয়াল ?" মনোবীণা মুখের ভঙ্গি করে হাসল।

চিরুনি রেখে দিল পশুপতি। "তুমি কি বলছ ! আমি

বাঘের বাবা সিংহ। একটা জাত-সিংহকে শেয়াল বলছ! জানো, আমরা সিংহী—পশুপতি সিংহ....”

“খুব হয়েছে সিংহমশাই, কাজের সময় দেখব। এখন দয়া করে বলুন, এর সঙ্গে কী খাবেন?”

“কী আবার খাব! আছে কি তোমার? পাঞ্জাবীর দোকান থেকে দুটো কাটলেট নিয়ে এলে হত। পাঁপর-টাঁপরও চলতে পারত, পট্যাটো চিপস....। যাক গে, শুধুই দাও তুমি!”

মাথা নাড়ল মনোবীণা। “না, শুধু শুধু খেতে দেব না। শুনেছি লিভার নষ্ট হয়।”

“দূর বাব্বা! একদিন একরত্তি হুইস্কিতে লিভার নষ্ট হবে কি? তুমি পাগল নাকি?”

মাথা নাড়তে নাড়তে মনোবীণা বলল, “না, আমি শুধু পেটে খেতে দেব না।....বেশ তো, কষা মাংস খাও....।”

“রাত্রে খাব রুটির সঙ্গে।”

“খেয়ো। এখন দু-এক টুকরো খাও।”

পশুপতি খুঁতখুঁত করে বলল, “দাও তবে।”

হাতের সেই শাড়ি আর নীচের জামাটা আলনায় সরিয়ে রেখেছিল আগেই মনোবীণা। হুইস্কির বোতলটা হাতেই ছিল। স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “খোলো, আমি সব আনছি।”

পশুপতি হাত বাড়াল।

মনোবীণা পাশের ঘর থেকে একে-একে সব এনে গুছিয়ে দিল। তাদের হরি মিত্তির লেনের এই বাড়িটা সাবেকী। পশুপতির বাবা, চন্দ্রনাথ শীলের কাছ থেকে কিনেছিলেন। পার্টিশান করা বাড়ি। ওপরে মাঝারী ধরনের দুটো ঘর—আর রাতের কাজ চালাবার জন্যে ছোট বাথরুম। নীচে রান্নাঘর, ভাঁড়ার, কল-টল, বাথরুম। দু-জন মানুষের সংসার বলে মনোবীণা বিকেলের দিকে আর রান্নাঘরে নামে

না। দোতলায় পাশের ঘরে খাবার-টাবার এনে রেখে দেয়। রাত্রে খাবার আগে জনতা স্টোভ জ্বালিয়ে গরম করে। কিংবা টুক্‌টাক কিছু করে নেয়। ওই ঘরেই তাদের খাওয়া-দাওয়া।

পশুপতিকে সব সাজিয়ে দিয়ে মনোবীণা আবার একবার ঘড়িটা দেখল। ঘড়ি সে বার বারই দেখছে। নটা বেজে গেছে।

মনোবীণা বলল, "তুমি যাও ; আমি বাথরুম থেকে আসছি।"

"আবার বাথরুম ! এই তো এসেই ঢুকেছিলে।"

"সে তো ইয়ের জন্যে। মুখটা একটু ধুয়ে আসি।"

পশুপতি কিছু বলল না। বড় মাপের হুইস্কি ঢেলে নিয়ে মাপ মতন জল মেশাতে লাগল।

মনোবীণা বাথরুমে চলে গেল।

ফিরতে মনোবীণার খানিকটা দেরীই হল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ও যে পাশের ঘরে গিয়েছে পশুপতি বুঝতে পারছিল। সাড়া পেয়েছে দু-চার বার। তারপর চুপচাপ। বৃষ্টির সেই পাতলা ঝিরঝিরে ভাব অল্পের জন্যে থেমে গিয়ে আবার জোর বৃষ্টি নেমেছে। মেঘ ডাকছে মাথার ওপর। ভাদ্রের শেষে এই বৃষ্টি হয়তো সারা রাত চলবে। চলুক। কাল রবিবার। পশুপতি থোড়াই ক্যেয়ার করে।

মনোবীণা ঘরে এল।

পশুপতি অবাক হয়ে স্ত্রীকে দেখল। ঘরের শাড়ি জামা পরনে নেই, তার বদলে সস্তা তসরের শাড়ি। কোনোরকমে গায়ে জড়ানো, গায়ে জামা নেই, পরনে সায়া নেই।

"কী ব্যাপার ?" পশুপতি বলল।

মনোবীণা হেসে বলল, "কিছু না। তখন থিয়েটারে যাবার সময় সন্ধ্যে দিতে ভুলে গিয়েছিলুম। মার নারায়ণের কাছে ধূপ-ধুনো দিই নি।'

"ও !"

পশুপতির মা বেঁচে থাকতে নারায়ণ-টারায়ণ রেখেছিলেন, জল বাতাসা দিতেন সকালে, সন্ধ্যে বেলায় ধূপ-ধুনো। ছেলের বউ-শাশুড়ী মারা যাবার পর থেকে নিয়মটা মেনে যায়। পশুপতির খেয়ালও থাকে না ! সকাল সন্ধ্যে কখন মনো জল বাতাসা দিচ্ছে —কে তার খোঁজ রাখে। তবু মনোবীণাকে তসর-টসর পরতে সে বড় দেখে নি।

মনোবীণা স্বামীকে আবার খানিকটা মদ ঢেলে নিতে দেখল।

"কত খাচ্ছ ?"

"এই তো, দু নম্বর নিচ্ছি।"

"বেশী খেও না।"

"না, তিন পর্যন্ত চালাব।"

"তারপর মাতাল হবে।"

"আরে না, আমি অত পাতি মালখোর নয়।"

মনোবীণা স্বামীর দিকে এগিয়ে এল। "দেখি, তোমার মুখের গন্ধ দেখি !"

পশুপতি হাঁ করল, মনোবীণা একেবারে স্বামীর গায়ে ঝুঁকে পড়ে মুখ নামিয়ে গন্ধ নিতে লাগল।

পশুপতি হাত বাড়াল।

"আঃ, লাগে—!" মনোবীণা স্বামীর হাত বুকের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে চোখে কটাক্ষ করে হাসল। "বুড়ী হয়ে গিয়েছি না ?"

"কোন শালা তোমায় বুড়ী বলে ?"

মনোবীণা সরে গেল, যাবার সময় যেন তার হাঁটার ভঙ্গিটা এমন লঘু করল যে পিছন দুলে উঠল।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল মনোবীণা। আয়নার দিকে তার মুখ, কাচের তলার দিকে পশুপতির মুখ দেখা যাচ্ছে।

স্বামীর দিকে পিছন করে দাঁড়িয়েই মনোবীণা রঙ্গের গলায় বলল, "থিয়েটারের ওই নাচিয়ে মেয়েটাকে তোমার খুব ভাল লাগছিল।"

"ধুৎ—!"

"বাজে কথা বলো না, চোখ বড় বড় করে গিলছিলে।"

"গিলতে আর দিলে কই, কান ধরে উঠিয়ে নিয়ে এলে।"

মনোবীণা পাশ ফিরে দাঁড়াল। "সত্যি। একেই পুরুষমানুষ বলে।"

পশুপতি খেতে খেতে হাসির গলায় বলল, "সে তো ভাই কবে—সেই মুনি-ঋষিদের টাইম থেকেই চলে আসছে। তোমরা নাচো, আমরা ধ্যান-ফ্যান ভেঙে লাফিয়ে উঠি।"

মনোবীণা আলনার দিকে সরে গেল, হাত বাড়াল। "তুমি যতই বলো, সাজগোজ করলে আমরাও এমন কিছু ফেলনা নয়।"

"কে বলল তুমি ফেলনা।"

"নই-ই তো" বলতে বলতে মনোবীণা আলনা থেকে সিলোনিজ সায়াটা তুলে নিল। নরম; সুতীর সায়ার মতন বড় ঘেরও নয়। বড় নরম, শরীরের সঙ্গে আঁটসাঁট হয়ে থাকে, সিরসির করে গা। গায়ের ওপর থেকে তসরের শাড়িটা আলগা করে মাথা গলিয়ে সায়াটা কোমরের কাছে ফেলে দিল মনোবীণা ঃ দিতে সায়াটা পায়ের কাছে নেমে গেল, তলার শাড়িটা টেনে টেনে বার করে নিতে লাগল।

পশুপতি একটা সিগারেট ধরাল। একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া হচ্ছে। হোক।

স্বামীর দিকে পিঠ। মনোবীণা তসরের শাড়ি আলগোছা তুলে নিয়ে আলনায় রাখল। কাঁধ পিঠ আবরণহীন। অল্প বয়সের, কচি বউয়ের লজ্জা তার নেই। কারই বা থাকে! যে দেখার লোক সে তো স্বামী।

লেসের কাজ করা জালি বসানো নীচের জামাটা নিয়ে বুক ঢাকতে ঢাকতে বলল, "ওই মেয়েটার মুখ কিন্তু বাপু ভাল না। অত রঙচঙ করেছে মুখে, চোখের টান তো কান পর্যন্ত ছড়িয়েছে, অথচ মুখের কোনো ছিরি নেই। মোটা মোটা ঠোঁট, নাকও মোটা। গাল কত বসা দেখেছ!"

পশুপতি কষা মাংসের প্লেট থেকে আরও একটু নিল। তেমন বানাতে পারে নি। মাংসটা বোধ হয় তেমন ভাল না।

নাইলনের সেই গভীর নীল শাড়িটা পরতে পরতে মনোবীণা বলল, 'তোমার খুব আফসোস হচ্ছে, না।'

"কেন?"

"শেষের নাচগুলো দেখতে পেলে না?"

"দেখতে দিলে না—"

"রাখো ওই নাচ দেখতে হয় না। কাপড় জামা খুলে মাথার ওপর হাত তুলে কোমর দোলালে অমন নাচ আমরাও নাচতে পারি।" বলতে বলতে মনোবীণা একবার কোমরের কাছে শাড়ি আর সায়ার তলায় কি যেন দেখে নিল।

পশুপতির এবার অল্প-অল্প নেশার টান লাগছিল। জিব সামান্য মোটা হচ্ছিল।

শাড়ি পরে মনোবীণা আবার ড্রেসিং টেবিলের কাছে এল। মাথার খোঁপাটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক করল। বেল ফুলের মালা খোঁপায় জড়াল বাহারী করে।

"কি গো সিংহীমশাই কথা বলছ না যে?"

"বলতে পারছি না।"

"কেন?"

"যা দিচ্ছ! আজ যেন টপ ফর্ম তোমার!"

"শাড়িটার জন্যে বলছ! এ তো পুরোনো, গত বছরেরও আগে

তুমি কিনে দিয়েছিলে। পাড় নেই বলে পরি না। খুব কম পরেছি। আজ ভেবেছিলাম পরব থিয়েটারে যাবার সময়। লজ্জা করল। আলনায় রেখে গিয়েছিলাম। খুলে ফেলব ?"

পশুপতি হাসতে লাগল। "খুলবে কেন! শাড়িটা তোমায় বেশ মানায়। পরলে মাইরি দশ বছর বয়েস কমে যায় তোমার।"

"ইয়ার্কি," মনোবীণা টেবিলের পাশে রাখা রজনীগন্ধার ডাঁটি থেকে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে স্বামীর দিকে ছুঁড়ে মারল।

পশুপতি মজার গলায় বলল, "তোমায় ভাল বললেও বিশ্বাস করবে না, এ তো মহা ফ্যাসাদ—!"

মনোবীণা মুখের শোভা বাড়াতে লাগল হালকা করে, দেবে কি দেবে না করে চোখে সুর্মা দিল।

পশুপতি দু-বারই বেশী বেশী নিয়েছিল। ফুরিয়ে যাচ্ছে দেখে গ্লাসেরটুকু শেষ করে আবার হুইস্কি নিল।

মনোবীণা এবার দেরাজের কাছে গিয়ে মিঠে পানের খিলি নিয়ে একটা পান খেল, তারপর হেলে দাঁড়িয়ে থাকল। "আবার ঢালছ কিন্তু।"

"তিন নম্বর ঢালছি।"

"এরপর নেশায় গড়াগড়ি দেবে।"

"না ভাই, দেব না। যদি দিই তা হলেও নিজের ঘরে বিছানায় দেব, রাস্তার নালায় দেব না। তবে তুমি ভেব না ভাই, মনো; আমি পরিষ্কার তোমায় দেখতে পাচ্ছি।

"পাচ্ছ ?"

"আলবাত পাচ্ছি।"

মনোবীণা এবার হালকা চালে স্বামীর কাছে এল।

পশুপতি অল্প জল মিশিয়ে নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে কাছে টানল।

"তোমার হাত গরম গরম লাগছে", মনোবীণা বলল।

"এসব খাবার পর একটু লাগে", পশুপতি স্ত্রীকে আরও কাছে টানল।

"বেশী গরম মশাই, একটু নয়।"

"সে তোমার জন্যে।"

মনোবীণা স্বামীর কাছে বসল। "এখন কী করবে ?"

"তোমায় দেখব।"

"রাখো। আমায় দেখার কিছু নেই। আঠারো বছর ধরে দেখছ। তাও যদি কচি থাকতাম—।"

"কচিতে গুলি মার। আমি কচি-ফচি চাই না। তুমি এখনও কেমন শেপে আছ ভাই, নো টোল-টাল।"

"আহা—!"

'মাইরি বলছি ! তোমার তেমন ওভার ওয়েট নেই, কোথাও লুজনেস নেই। এই বয়েসে এমন টাইট নরম্যাল ফিগার কে রাখে গো ! বয়েসে যা মানায় তোমার ঠিক সেই রকম ! আই লাভ ইউ মাই ডিয়ার, বেজী।"

মনোবীণা স্বামীর কাঁধের কাছটায় কামড়ে দিল ছেলেমানুষীর ভঙ্গীতে। পশুপতি বউকে কখনো কখনো আদরে গলে গিয়ে 'বেজী' বলে। বাঁজা-র অপভ্রংশ। মনোবীণা রাগ করে না, পশুপতি এমন সময় বলে যখন তার আদর আর সোহাগের ভরা ভাব, মনোবীণারও টলটলে মনের অবস্থা, কাজেই তখন রাগের আর কিছু থাকে না।

পশুপতি বউকে মুখের কাছে নিয়ে ঘাড়ের কাছে মুখ ঘষতে লাগল। খোঁপায় তার নাক লাগছে। বেলফুলের গন্ধ। বৃষ্টির শব্দটাও কানে এল।

"মনো!"

'উঁ !'

"তুমি আমার কে ?"

"বউ।"

"ধুৎ, শুধু বউ কেন হবে! জায়া, জননী, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী—সব— অলমাইটি।"

"থিয়েটার হচ্ছে ?"

"না ভাই, দিব্যি করে বলছি—থিয়েটার নয়। সে এককালে করতাম। কলেজে পড়ার সময়। তখন তুমি ছিলে না।"

পশুপতি স্ত্রীকে আদর করতে লাগল। মনোবীণা স্বামীর গেঞ্জির বুকের কাছটা আঙুল দিয়ে সরিয়ে মাথা ঘষতে লাগল। সিঁদুরের দাগ লাগল বুকে গেঞ্জিতে।

পশুপতি মুখ সরিয়ে এবার অনেকটা খেয়ে নিল একসঙ্গে।

মনোবীণা পানের ঠোঁট পশুপতির গালে ঘষে দিয়ে কানের লতি কামড়ে দিল।

পশুপতি স্ত্রীর শাড়ির আঁচল খুলে দিল। তার নেশা হয়েছে। চোখ টানছিল। নিঃশ্বাস গরম। মাথা ঝুঁকে যাচ্ছে।

"মনো।"

"বলো।"

"আমরা খুব হ্যাপি। আজকাল স্বামী-স্ত্রীরা খুব কম হ্যাপি হয়। শুনি তো বন্ধু-বান্ধবের কাছে। সব সময় গজগজ করছে। আমরা কিন্তু সুখী। কল্যাণরা বলে, পশুপতিদা তুমি স্ত্রৈণ। আমি বলি; ইডিয়েট, তোরা তো বউকে শুধু ইউটিলাইজ করিস ভালবাসিস না। আমি ভালবাসি। বউ ছাড়া আমার কেউ নেই। ঠিক কি না বলো ?"

মনোবীণা দূর থেকেই ঘড়িটা দেখল। টাইমপিস ঘড়ি। নটা চল্লিশ মতন।

সময়টা দেখার পর মনোবীণার বুক যেন কেঁপে উঠল। আর

সাত মিনিট। তারপর সেই যোগ। শুভ সময় পড়ে যাবে। প্রায় সোয়া-ঘণ্টা থাকবে। মনোবীণা এতই চঞ্চল ও অধৈর্য হল যে তার হাত কাঁপতে লাগল। সামান্য ঘাম লাগল বুকে।

পশুপতি স্ত্রীর শাড়ি সরিয়ে দিচ্ছিল। বুকে-পিঠে কাপড় নেই; কোমর থেকে আঁচলটা ঝুলে মাটিতে গড়াচ্ছে। সেই চমৎকার লেসের কাজ করা, জালি দেওয়া নীচের জামাটা পশুপতি দেখতে লাগল। ভরাট, গোল অথচ শক্ত হাত, ডুবে থাকা কণ্ঠা, খাটো গলা— পশুপতি স্ত্রীর কোনো খুঁত দেখতে পেল না। পিঠের দিকে হাত বাড়াল। মেদ এমন করে মাখানো যাতে সমস্ত পিঠ মোলায়েম হয়ে আছে। পশুপতি স্ত্রীর বুক এবং ওপর পেটের দিকে নেশা এবং কামনার চোখে তাকিয়ে বলল, "বেজী, কে বলবে তোমার বয়েস চল্লিশ! চল্লিশে এই চেহারা। কাশীর পাকা পেয়ারার মতন মাইরি", বলতে বলতে পশুপতি স্ত্রীকে মুখের কাছে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে থাকল।

মনোবীণা ওই অবস্থাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে আবার ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর স্বামীর মাথার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগল। পশুপতি ঠিক বুকের ওপর লেসে মুখ রেখে ঠোঁট দিয়ে কামড়াচ্ছে।

"আর খাবে না?" মনোবীণা গাঢ় গলায় বলল।

পশুপতি আবেগের দু-চারটে শব্দ করল, ছেলেমানুষের ঢঙে আদর করতে লাগল বুকে মুখ গুঁজে, তারপর মুখ সরিয়ে নিল। এখনও গ্লাসে খানিকটা রয়েছে। ঝোঁকের মাথায় পুরোটাই এক চুমুকে খেয়ে ফেলল।

"তুমি ভাই, পাগল করে দিচ্ছ" পশুপতি কামের গলায় বলল। বলে স্ত্রীর পিঠের দিকে হাত বাড়াল। বেশ ঘাম হচ্ছিল তার। চোখ লালচে, পাতা ভারী হয়ে এসেছে। জড়ানো জিবে পশুপতি

বলল, "বাঁজা বউয়ের একটা আলাদা-চার্ম আছে ভাই মনো, সে তুমি যাই বলো। ভেরী সলিড!"

মনোবীণা স্বামীর হাত সরিয়ে দেবার জন্যে সামান্য হেলে গেল পাশে। "টেনো না, ছিঁড়ে যাবে। চলো, বিছানায় চলো।"

পশুপতিই উঠে দাঁড়াল, না মনোবীণাই স্বামীর হাত ধরে টেনে নিচ্ছিল বোঝা গেল না; পশুপতি উঠে দাঁড়াল। সামান্য হেলে পড়ছিল।

মনোবীণা স্বামীকে নিয়ে বিছানায় আসার সময় পশুপতি যেন খেলাচ্ছলে স্ত্রীর শাড়ি টেনে টেনে খুলে দিতে লাগল। মনোবীণা খুশী হচ্ছিল, তবু চাপা গলায় বলল—"কি করছ? কাপড়-চোপড় সব খুলে দিচ্ছ।"

"দেব, আলবাত দেব। নিজের বউয়ের কাপড় খুলছি কোন শালা বলবে—" বলেই পশুপতির মাথায় বিদ্যে জাহিরের ঝোঁক চাপল, বলল, "তোমরা ভাই শুধু দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণটাই জান? ডু ইউ নো দি বিউটিফুল চ্যাপটার? শিভো ওআজ মেকিং লাভ উইথ উমা? মাইরি মনো, শিবেবেটা উমারাণীর গায়ে এক টুকরো আঁশও থাকতে দেয় নি। কুমারসম্ভব পড়ো। সংস্কৃত ভুলে মেরে দিয়েছি—নয়তো শ্লোকটা শুনিয়ে দিতাম।"

পশুপতি বিছানায় বসে পড়ল। মনোবীণা সামনে দাঁড়িয়ে। পশুপতি দু-হাতে কোমড় জড়িয়ে ধরেছে মনোবীণার। নেশা আর কামের ঘোলাটে চোখে দেখছে স্ত্রীকে। দেখতে দেখতে কাছে—নিজের মুখের কাছে টেনে নিল। স্ত্রীর বুকে পেটে কোমরে মুখ ঘষতে লাগল জোরে জোরে, চুমু খেতে লাগল। মনোবীণা নীচের জামার পিঠের দিকে হুক খুলে ফেলল। পশুপতি ছেলেমানুষের মতন বলতে লাগল, "তোমায় আমার এতো ভাল লাগে মনো—এতো ভাল লাগে....তোমায় আমি কেন এত ভালবাসি, কেন,

কেন ?" পশুপতির কথাগুলো যেন ভাঙা রেকর্ডের একই জায়গায় পড়ে বার বার বাজতে লাগল।

মনোবীণা আর ঘড়ির দিকে তাকাল না। দরকার নেই। সময় হয়ে গেছে।

"তোমার সবটাই কী নরম মনো. বিশ্রী নরম নয় : ভেতরে শক্ত ....বাইরে নরম।....এমন বউ লাখে একটা জোটে", বলতে বলতে পশুপতি স্ত্রীকে টেনে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আড়াআড়ি।

মনোবীণার মনে হল, সেই শুভ সময় শুরু হয়ে গেছে। পশুপতি তার বুক থেকে কাপড়ের শেষ আবরণটুকুও খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল। পাগলের মতন চুমু খাচ্ছে। খাক। একটু জোরে দাঁত দিল, দিক। মনোবীণা কিছুই গ্রাহ্য করতে চায় না। অশ্বিনী নক্ষত্রের সেই শুভ যোগ চলছে এখন। আজ ত্রয়োদশী। মনোবীণার আজ বারো দিন চলছে। সারাদিন সে শুদ্ধ, একমন, একই ধ্যান নিয়ে থেকেছে। আর থাকার কথা নয়।

যেটুকু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মনোবীণা তার মধ্যেই তার মাথার খোঁপা আলগা হয়ে গেছে, ফুলের মালা ছিঁড়ে পড়েছে, পশুপতি যেন দস্যুর মতন তার সমস্ত কিছু লুঠে নিচ্ছে। নিক। মনোবীণার এই ইচ্ছা ছিল। সাধ ছিল। ন'টা বাগানোর পর এই যে যোগ পড়েছে এই শুভ যোগের মধ্যেই মনোবীণাকে যা কিছু পূরণ করে নিতে হবে। মনস্কাম-সিদ্ধ যোগ তার। কৃষ্ণপক্ষ। ত্রয়োদশী তিথি। অশ্বিনী নক্ষত্র।

পশুপতি যে সিলোনিজ সায়া নিয়ে খেলা করছে মনোবীণার, সেটা সে বুঝতে পারল।

"আঃ !"

"কী ?"

"কি-যে করছ ! এটুকু থাকতে দাও।"

"না, না, না—" পশুপতি কিছুই থাকতে দেবে না।

গিঁট আলগা হচ্ছে মনোবীণা বুঝতে পারল। কোমরের বাঁধন ঢিলে হল। মসৃণ স্পর্শ যা তা কোমর ও তলপেট থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত জড়ানো ছিল তার খানিকটা আর থাকল না। মনোবীণা মনে মনে চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। মনে মনে ইচ্ছাময়ীকে স্মরণ করল।

আর ঠিক এই সময়ে পশুপতি হঠাৎ মনোবীণার কোমরের তলায় হাত রেখে কী যেন টানল। "এটা কী?"

জবাব দিল না মনোবীণা।

পশুপতি আঙুল দিয়ে টেনে টেনে দেখতে লাগল জিনিসটা। তারপর বউকে সামান্য কাত করে দিল। "লাল সুতোয় বাঁধা কী পরেছ এটা?"

মনোবীণা তবু জবাব দিল না। ইচ্ছাময়ী মা বলেছিলেন, তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। দিন নক্ষত্র সময় যোগ সবে বলে দিয়েছিলেন, লিখে দিয়েছিলেন কাগজে। আর কি যেন এক ওষধি লাল সুতোয় জড়িয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শুদ্ধ হয়ে ঠাকুরের নাম করে পরে নিবি সহবাসের আগে। স্বামীকে কিছু বলবি না, জানতে দিবি না। তোর কাজ হল, স্বামীকে কিছু না জানিয়ে প্রবৃত্ত করানো। দেখিস, স্বামী যেন ষোলো আনা মন নিয়ে তোর পাশে শোয়।

পশুপতি আবার বলল, "এটা কী, বলছ না?"

মনোবীণা স্বামীর হাত সরিয়ে দিতে গেল, পারল না।

পশুপতি সুতো ধরে টান মারল, যেন ছিঁড়ে দেবে।

মনোবীণা সায়াটা পেট পর্যন্ত তুলে নেবার চেষ্টা করল। সুতোটা ঢাকতে চায়।

"কি এটা? বলবে না?"

মনোবীণা ডান হাত বাড়িয়ে স্বামীকে নিজের কাছে টানতে গেল। পারল না। বিছানায় উঠে বসল।

পশুপতি সন্দেহ করেছিল। মনোবীণা তাকে জড়িয়ে কাছে টেনে নেবার আগেই ভীষণ রুক্ষ গলায় বলল, "কী পরেছ ওটা?"

"যাই পরি, তুমি এসো না গো—"

"এই শালার লাল সুতো কী? কোমরে সুতোর সঙ্গে কী ওটা গাছের ছাল-ফাল বাঁধা আছে?"

"যা আছে থাক— ; তোমার মনোর এত বড় চেহারা, কি একটু বাঁধা থাকল...."

পশুপতি বুঝতে পারল। মাথায় দপ্ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল। ও শালা, এই জন্যে এত ঘটা? এত ফন্দি ?....এত আদিখ্যেতা?

পশুপতি যেন অনুভব করল, সে কিছু নয়; তার আঠারো বছরের স্ত্রী, জীবনের একমাত্র সঙ্গীর কাছেও প্রধানতম নয়। মনোবীণা তার সঙ্গে ছলনা করছিল, এত আয়োজনের উদ্দেশ্য পশুপতি নয়, সে নিমিত্তমাত্র; মনোবীণা নিজের প্রয়োজনে স্বামীকে যন্ত্রের মতন ব্যবহার করতে চাইছিল। কিন্তু পশুপতি এই বয়েসে তার বিগত-যৌবনা স্ত্রীর দেহ-মনের প্রতি যে আসক্ত, অনুরক্ত, আবেগপূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছিল তার কোনো মূল্য মনোবীণার কাছে নেই। আশ্চর্য! পশুপতির মনে হচ্ছিল, মনোবীণা তাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করে না, সে তার স্ত্রীর কাছে যথেষ্ট নয়, পশুপতি তার এই অকৃত্রিম প্রেম, অনুরাগ ও আসক্তি নিয়েও স্ত্রীকে পরিপূর্ণ সুখী করতে পারল না। পারবে না!

নিজের এই আকস্মিক মূল্যহীনতা ও ব্যর্থতা পশুপতিকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ করে তুলছিল। মুখ লাল হয়ে উঠছিল। রাগে কাঁপছিল পশুপতি। ঘৃণা, আক্রোশ ও তিক্ততার সঙ্গে স্ত্রীকে দেখছিল।

পাগলের মতন দৃষ্টি। খেপাটে আচমকা স্ত্রীর গালে প্রচণ্ড জোরে এক চড় মারল। এত জোরে মারল যে, ঘরের মধ্যে শব্দটা যেন ছড়িয়ে পড়ল, মনোবীণা বিছানায় পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল। লাল হয়ে আঙ্গুলের দাগ ফুটতে লাগল।

পশুপতি স্ত্রীকে হ্যাঁচকা টান মেরে বিছানা থেকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলল, “শালা, আমি তোমার কেউ নয়—! আমার সঙ্গে ভাঁওতা, খেলা? বাঁজা মেয়েছেলে কোথাকার, বেশ্যার মতন ঢঙ মারছ? এখনও বাচ্চা বাচ্চা? তুকতাক? কোমরে শেকড় বাঁধছ? চলে যাও আমার চোখের সামনে থেকে, চলে যাও, নয়তো খুন করে ফেলব তোমায়…।” পশুপতির মদ খাওয়া ভাঙা গলা, তার জড়ানো স্বর কর্কশ, ক্লান্ত অদ্ভুত এক বিলাপের মতন শোনাল।

ঠেলে, লাথি মেরে স্ত্রীকে যেন মাটিতে ফেলেই দিচ্ছিল পশুপতি। মনোবীণা পড়তে পড়তে সামলে নিল।

ঘরে আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হল না মনোবীণার, বাইরে পালিয়ে এল।

বাইরে অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। মনোবীণার শোবার ঘরের হালকা আলো দরজার বাইরে বারান্দায় পড়ে আছে ফ্যাকাশে ভাবে। এই ঘন বাদলার বাতাসে শীত করছিল মনোবীণার। তার গায়ে কোন আবরণ নেই। সায়াটা কোনরকমে কোমরে জড়ানো। মাথার খোঁপা ঘারে ভেঙে পড়েছে। চড় খাওয়া গাল ফুলে যাচ্ছিল, টনটন করছিল ভীষণ! কোমরে, পিছনে লাথি লেগেছে। কোমরের তলাতেও ব্যাথা।

স্তব্ধ অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন বুকের কোন অভ্যন্তর থেকে সিসের মতন ভারী এক কান্না কণ্ঠনালীকে প্রচণ্ড কাতর করে গলায় এসে উঠল। শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল

মনোবীণার। ফাঁস-লাগা গলার মতন তার গলা ফুলে উঠল। তারপর মুখ হাঁ করে কেঁদে ফেলল।

ভেতরে কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির গুঁড়ো উড়ে এসে-এসে বার বার গায়ে মাথায় লাগছিল মনোবীণার।

হঠাৎ কী যেন হল মনোবীণার, দৃষ্টি তার দোতলার সিঁড়ির মুখে স্থির হয়ে থাকল। কিছু যেন ওই সিঁড়ির কাছটায় ধীরে ধীরে ঘটে যাচ্ছিল। কী, তা মনোবীণা বুঝতে পারল না। ক্রমেই তার ঘোর এল। আস্তে আস্তে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে থাকল। স্থির, অপলক দৃষ্টি। আচ্ছন্ন। প্রথমে যেন কী এক ঘৃণা ও জ্বালার টুকরো চোখে জ্বলে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত আর জ্বলল না। বরং কেমন কাতরতা এল, মায়া জাগল। পনেরো বছর আগে একদিন এইখানে মনোবীণার পা পিছলে গিয়েছিল। এই সিঁড়িতেই সে পড়েছিল প্রথম, প্রথম আঘাত ও যন্ত্রণা এইখানে পেয়েছিল। সেদিন মনোবীণার মধ্যে তার প্রার্থিত প্রাণটি ছিল। কেমন তার আকার, সে শুধুই একটা রক্তমাংসের তাল ছিল, নাকি তার অবয়ব হয়েছিল, হাত পা মুখ চোখ, কেমন গড়ন হয়েছিল তার, সে পশুপক্ষির দিকে হেলে যাচ্ছিল নাকি মনোবীণার—কিছুই জানা নেই। মনোবীণা কিছু জানে না। কখনো কখনো যখন মনোবীণার দিন ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে তাকিয়ে বড় উতলা হয়ে ওঠে—তখন যেন তার দিনের এবং রাত্রের অলস মুহূর্তে অতি অস্পষ্ট, অবোধ, অসহায় কেউ মনের মধ্যে ভেসে আসে আবার চলে যায়।

মনোবীণা সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরঝির করে। বাতাস দিচ্ছে এলোমেলো; অন্ধকার জলভরা আকাশের কোনো কোনো প্রান্তে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। মনোবীণা বসে থাকল। সম্পূর্ণই আচ্ছন্ন। সর্বাঙ্গ সিক্ত, রোমকূপ শীতে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

বসে থাকতে থাকতে মনোবীণা অনুভব করার চেষ্টা করছিল, এই অচেতন প্রাণহীন সিঁড়িই সেই রক্তসদৃশ অবয়বটিকে স্পর্শ করতে পেরেছিল কিনা! যদি পেরে থাকে তবে কি কোনোদিন তাকে সেই অনুভব জানিয়ে দিতে পারে না! কোন রকমেই কি সম্ভব নয়?

অনুভূতির এই গভীরতম রহস্যময় অন্ধকারে মনোবীণা যেন অনুভব করল, তার গর্ভের মধ্যে যা নেই তাও যেন কেমন এক সৃষ্টির মায়া দিয়ে ঘেরা। পশুপতি তার মধ্যেকার মানুষ নয়, সে তার সৃষ্টি নয়, পশুপতিকে সে বাইরে থেকে পেয়েছিল। এমন করে গোপনে অন্ধকারে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করার জন্যে কাতর হয় নি।

ভোরবেলা মনোবীণার ঘুম ভাঙল। ঘুমের চোখে তার পরনের শুকনো শাড়ি এবং এলো করা চুলের ওপর হাত রাখল। তারপরই গা কেমন শিউরে উঠল। তাকাল। সে পাশ ফিরে শুয়ে। ঘুমের মধ্যে স্বামীর দিকে পাশ ফিরে গেছে। মনোবীণার বুকের কাপড় আলগা। গায়ে জামা নেই। ওপরের বুক উন্মুক্ত। পাশ ফিরে শুয়ে থাকার দরুন বুক ভার হয়ে নত হয়ে রয়েছে।

মনোবীণার বুকের তলায় পশুপতির মুখ। উপুর হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে সে শুয়ে আছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

আটচল্লিশ বছরের এই স্বামীর ঘুমন্ত, কিছুটা যেন ক্লান্ত, ম্লান অথচ সরল মুখ দেখতে দেখতে মনোবীণার সর্বাঙ্গ শীতের বাতাস লাগার মতন কেঁপে উঠল।

অনাবৃত আনত স্তনের বৃন্তটি ক্রমশই কাঁটা লেগে শক্ত ও স্ফীত হয়ে উঠছে অনুভব করল মনোবীণা। পশুপতির ঘুমন্ত মুখের ওপর সেই বৃন্ত আরও স্ফীত হয়ে উঠতে পারে ভেবে মনোবীণা তার খোলা বুক ঢেকে নিল।